লগন গান্ধার

দেবেশ রায়

TABLE OF CONTENTS

লগন গান্ধার
এক
দুই
তিন
চার
পাঁচ
ছয়
সাত
আট
নয়
দশ
এগার
বার
তের
চৌদ্দ
পনের
ষোল
সতের
আঠার
উনিশ
কুড়ি
একুশ

https://boierhut.com/fb

লগন গান্ধার

দেবেশ রায়

-

-

উৎসর্গ
রণজিৎ সিংহ
বন্ধুকে ১৯৯৫

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এক

শেয়ালদা মেইনের হুইলারের সামনে সুরঞ্জনা একটু আগেই পৌঁছে যায়—কলকাতায় কোথাও যথাসময়ে পৌঁছুতে হলে হাতে সময় নিয়ে বেরিয়ে, শেষে অনেক সময় বিঘ্নহীন পথ পেরিয়ে আগেভাগেই হাজির হতে হয় যেমন। সুরঞ্জনার একটু দেরি হলে মহাভারত অশুদ্ধ হতো না, আলোকময় আগে এসে গেলে তার জন্যে এখানে, এই হুইলারের সামনেই অপেক্ষা করত, আর তেমন একটু বিশ্রামের মন নিয়েই তো সুরঞ্জনার আশা উচিত ছিল। আগে যখন পৌঁছেই গেছে, সে শেয়ালদা স্টেশনটায় একটু ঘুরপাক খেতেও পারত। তেমন কিছুও না করে একেবারে সরাসরি এসে হুইলারের এই ঘুপচিটার মধ্যে ঢুকে গেল, এমনকি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পত্র-পত্রিকাগুলোর ওপর চোখও বোলাল না। যেন আলোকের সঙ্গে তার আজ এমনই দরকার যে তার অন্য কোনো দিকে মন দেয়ার মতো কোনো অবসর নেই।

অথচ সুরঞ্জনা জানে যে আলোক এলে সে আর তার অস্থিরতার কারণটা আলোককে বলতে পারবে না। এমন হতে পারে, আলোক এসে পড়লে সে আর অস্থির বোধ করবে না। আবার, এমনও তো আজকাল যে-কোনো দিন ঘটে যাচ্ছে যে সে না-পারল আলোককে তার অস্থিরতার কারণ বোঝাতে, অথচ না-পারল আলোকের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলতে, শেষে আজকের দেখা হওয়াটা অর্থহীন হয়ে গেল এমন একটা বোধ নিয়ে দুজনের ছাড়াছাড়ি হলো।

আলোক আজ সেই চিঠিটা টাইপ করে খামে পুরে নিয়ে আসবে, কাল সেই চিঠিটা সুরঞ্জনার অফিসে জমা দেবে—এখন পর্যন্ত এ রকমই ব্যবস্থা, মানে কথা হয়ে আছে। চিঠিটা কি আর সুরঞ্জনা তার অফিসে টাইপ করে নিতে পারত না? অফিসে যদি না-পারত তাহলে বাইরে কোথাও থেকে টাইপ করে নিত। আলোককে ইছাপুরের অফিস থেকে চিঠি টাইপ করে এনে সুরঞ্জনাকে দিতে হবে আর সুরঞ্জনা সেটা সই করে অফিসে জমা দেবে, তাও আবার কালই, ঘটনাটা এমন না-হতেও তো পারত। এমন না-হওয়ারই তো কথা ছিল গত ছ-মাস। বা এক বছর। বা দুই বছর। আলোক তো ওদের ইছাপুর অফিসে বদলি নিয়েছে দুই বছরের বেশি, বদলি নেবারও কয়েক মাস পর, ক-মাস পর, ছ-মাস আট মাস, এক বছরের আগে কি কোয়ার্টার পাওয়া যায়? তা হলে এতদিন ধরেই এই চিঠি দেয়ার ব্যাপারটিকে পিছিয়ে দিয়েছে সুরঞ্জনা?

সুরঞ্জনা ওখানে, শেয়ালদা স্টেশনের হুইলারের সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত কিছুর জন্যে নিজেকেই দায়ী করছিল। আজকাল সে তাই করছে। বাড়িতেও, অফিসেও, অন্য সময়েও। যতই আলোক নিশ্চিতভাবে অবস্থাটাকে পাকাপাকি বদলাতে যাচ্ছে, ততই সুরঞ্জনা সমস্ত কিছুর জন্যে নিজেকে

https://boierhut.com/fb

দায়ী করছে। সুরঞ্জনা এই অবস্থাটা থেকে পালাতে চাইছে না। সে জানে, পালানো তার পক্ষে অসম্ভব। আলোকের সামর্থ্য তার জীবনে এমনই জড়িয়ে গেছে যে তার পক্ষে এখন সেটা ছাড়া বাঁচা মুশকিল।

হ্যাঁ, আলোকের সমর্থন ছাড়া সুরঞ্জনার পক্ষে এখন জীবনযাপন করা মুশকিল, এই ঘটনাকে সুরঞ্জনার আর-কোনো বিকল্প ভেবে ছোট করতে চায় না। সে বোধ হয় সারা জীবনে এই একটি সম্পর্কের ব্যাপারেই নিজের অন্তস্তলে এত নিশ্চিত। ছেলেমেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কও তো আরোপিত। সে কি চেয়েছিল, বিয়ের ঠিক পরের বছরই তার মেয়ে হয়ে যাক? সেও চায়নি, তার স্বামীও চায়নি। মাত্র একুশে বিয়ে করতে রাজি হওয়ার পিছনে ছিল বেশ কয়েকটা বছর দায়হীন, দায়িত্বহীন ফুর্তিতে কাটানোর এক স্বার্থপর লোভ। বরং ছেলে হওয়ার বেলায় দুজনের একটা হিসেব কাজ করেছিল, মেয়ের যখন চার-পাঁচ বছর বয়স, তখন একটা ছেলে হলে এই এক ধাক্কায় দুটো বাচ্চা মানুষ হয়ে যাবে। সে-সব হিসেব-নিকেশ পরিকল্পনা এতদিন আগের ঘটনা, যেন তার এ জীবনের সঙ্গে সেগুলো সম্পর্কশূন্য। আলোকই একমাত্র তার জীবনের সঙ্গে বাঁধা। তার নিজের তৈরি এ-সম্পর্ককে সে নিজেই লালন করেছে। সেই সম্পর্কের ভিতর দিয়ে সুরঞ্জনা আবিষ্কার করেছে, সে শুধু সম্পর্কের মৃতদেহ বহন করছে না, সে নতুন সম্পর্ক নির্মাণও করতে পারে।

সেই সম্পর্কের সূত্র ধরেই সুরঞ্জনা তার এই বর্তমান অনিশ্চয়তায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই সম্পর্ক নতুন একটা গড়ন পেতে চাইছে। সেই নতুন গড়ন পাওয়াটা যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক। অথচ সুরঞ্জনা বুঝে উঠতে পারছে না, সম্পর্কের এই নতুন গড়নটা সে দিতে পারবে কি না। সুরঞ্জনা নিজেকে নিয়ে স্পষ্ট নয়। সে শুধু এটুকু জানে, আলোক যা চাইছে তা সব দিক দিয়ে ঠিক, ষোল আনা ঠিক, শতকরা একশ ভাগ ঠিক। সে শুধু একটুকু জানে, সে যে গত প্রায় এক বছর, বা হয়তো দেড়-দুই বছরই হবে, সুরঞ্জনা নিজেকে দোষ দিচ্ছে যখন তখন সময়টাকে বাড়িয়েই নিচ্ছে, বা এত অনির্দিষ্ট রাখারই-বা কী আছে, তাদের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে বছর দুয়েক হলো, রেজিস্ট্রেশন যখন হয়েছে তখনই তো ঠিক হয়েছিল তারা এখন থেকে একসঙ্গে থাকবে, কলকাতায় সুরঞ্জনার কোয়ার্টারে আলোকের থাকা মুশকিল, সুরঞ্জনার মেয়ে ইস্কাপন কিছুতেই আলোককে মেনে নেবে না, কলকাতায় আলোকের বাড়িতে সুরঞ্জনার থাকা মুশকিল, একই শহরে তার ছেলেমেয়ে থাকবে শহরের এক প্রান্তের এক বাড়িতে আর তারা থাকবে শহরের আর-এক প্রান্তের আর-এক বাড়িতে? বরং সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা এটাই যে আলোক ইছাপুরে ওদের অফিসে বদলি নিল, কোয়ার্টার নিল, আলোককে নিয়ে সুরঞ্জনার সংসার থাকল ইছাপুরে আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুরঞ্জনার সংসার থাকল কলকাতাতেই, ও-রকম নিজেকে যদি দু-জায়গায় দু-টুকরো করে দিতে পারত সুরঞ্জনা তা হলে সেসব দিক সামলাতে পারবে, ভেবেছিল সামলাতে পারত, ইস্কাপন তো তার সঙ্গে আলোকের

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সম্পর্কের অর্থ বোঝে না তা নয়, সুরঞ্জনা যে ইস্কাপনকে বুঝিয়ে দেয়নি সে কোনোভাবেই আলোকের সঙ্গে সম্পর্ক বদলাবে না—তাও নয়।

তবু ঘটনাটা ঘটানো যাচ্ছে না, বারবার ঠেকে যাচ্ছে, বারবার ঠেকিয়ে দিচ্ছে সে নিজেই, সুরঞ্জনা। অথচ তার মতো এটা তো আর কেউ অনুভব দিয়ে জানে না—নিজেকে আলোকময় আর তার ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্পষ্ট দু'ভাগ করে দিলেই, সুরঞ্জনা দুই দিক রক্ষা করতে পারবে। আলোক বেশ জোর দিয়ে অনেকবার বলেছে—ওর কোনো দু'দিক নেই, একটা দিকই আছে, সুরঞ্জনা যদি সাহস করে সেই একটা দিকের ওপর জোর দেয় তা হলে বাকি দিকগুলো নিজের থেকেই ঠিক হয়ে যাবে। হয়তো আলোকের কথাটাই সত্য। আলোক যখন থাকে না তখন সুরঞ্জনা ভাবে, আলোকের কথাটা ষোল আনা সত্য, কিন্তু কোথায় একটা সাহসের অভাব বোধ করে ফেলছে সুরঞ্জনা। তার ভয় করছে, তারা যেভাবে ভাবছে সেভাবে যদি ঘটনা মোড় না নেয় তা হলে এমন কোনো সর্বনাশের মুখোমুখি পড়ে যাবে না তো সুরঞ্জনা যে সে আলোককেও হারাবে, তার ছেলেমেয়েদেরও হারাবে। কী ভাবে হারাবে তা তার ভাবনাতে আসে না। তেমন কোনো আশঙ্কার কথাও সে ভাবতে পারে না। ইস্কাপন বা তাতা যেমন আছে তেমন নেই, বা, আলোক আর তার সম্পর্ক যেমন আছে তেমন নেই—এ রকম কোনো আশঙ্কাকে সে প্রশ্রয় দিতে চায় না। বরং সে তার স্বামীর অফিসে স্বামীর মৃত্যুর কারণে চাকরি পাওয়ার পর, এই চৌদ্দ-পনের বছর ধরে নিজেকে যেভাবে ভেঙেছে ও গড়েছে তাতে ইস্কাপন আর তাতা যেমন সত্য, আলোকময়ও তেমিন সত্য। এখন এই একচল্লিশ বছর বয়সে এই দুই সত্যের কোনো একটিকেও হারিয়ে সে নতুন করে বাঁচার কথা ভাবতে পারে না।

সুরঞ্জনা নিজের মনে কখনো কখনো ভাবে, যেমন, এখন আলোকময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ভাবছে—সুরঞ্জনা কি আসলে বর্তমান অবস্থাটাতেই সন্তুষ্ট থাকতে চাইছে, এর আর-কোনো পরিবর্তন সে চাইছে না। সে কি চাইছে অপরিবর্তিত এই অবস্থায় ইস্কাপন তার পড়াশোনা শেষ করুক। যদি এবার জয়েন্ট এন্ট্রান্স পায় তা হলে ওর তো ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করতে লাগবে চার-পাঁচ বছর। সেই চার-পাঁচ বছরে তাতার উচ্চ মাধ্যমিক হয়ে যাবে। আলোকময় ইছাপুরেই থাক। না-হয় ইছাপুরে আলোকের কোয়ার্টারে গিয়ে থাকবে সুরঞ্জনা। সে কথা ছেলেমেয়েদের জানাবার দরকার কী? কী বলে সে কোয়ার্টারে তার পরিচয় দেবে আলোক? যা ঘটনা, আলোক ইছাপুরে তাই বলুক। বলুক যে সুরঞ্জনা তার স্ত্রী, সুরঞ্জনার আগের স্বামীর একটি মেয়ে ও একটি ছেলে আছে। ইছাপুরে সুরঞ্জনা সে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে? এ রকম একটা পালানোর পথই কি সুরঞ্জনা কখনো কখনো ভেবে ফেলেছে, আর কোনো পথ ভেবে না পেয়ে? তাতে ছেলেমেয়েরাও এক রকমভাবে জেনে যাবে, তাদের মা ইছাপুরে আলোকময়ের কাছেই থাকে। সেই গোপন জানাটা ভয়ংকর জানা। ঐ জায়গায় এসেই সুরঞ্জনা ঠেকে যাচ্ছে। তা ছাড়া আলোকই-বা এই অসম্মানের

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

জীবন মেনে নেবে কেন? সুরঞ্জনাই-বা এই অসম্মানের জীবন যাপন করতে আলোককে বলবে কেন? সে তো আলোককেও রক্ষা করতে চায়। আলোক তো তার আপন, স্বামী যেমন আপন হয়।

দুই

সুরঞ্জনা দূর থেকেই দেখে আলোকময় তার দিকে এগিয়ে আসছে, হাতের একটা ঠোঙা থেকে কিছু একটা তুলে মুখে ফেলতে ফেলতে। আলোক তাকে দেখেছে কি না সেটা অনুমান করতে পারে না সুরঞ্জনা। সে আঁচলটা ঘাড়ের ওপর একটু টানে, বাঁ হাতের নিচে ব্যাগটা ছিল, সেটা বদলে ডান হাতের নিচে নেয়, বোধ হয় এতক্ষণ এক পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এখন দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। নিজেকে এতটা প্রস্তুত ভঙ্গিতে নিয়েও সে বুঝতে পারে না, আলোক তাকে দেখেছে কি না। সে এক পা এগিয়েও যায়।

আলোক তার দিকে এগিয়ে আসে। এসেই সামনে ঠোঙাটা মেলে ধরে, 'ঘটি গরম।' ঠোঙার ভিতর হাত দিয়ে চানাচুর তুলে নেয় সুরঞ্জনা; তারপর মুখের সামনে ধরে জিভ বের করে একটুখানি মুখে নেয়। আলোকময় আঙুলে তুলে ঘাড়টা পিছনে হেলিয়ে হাঁ করে চানাচুরটা মুখে ফেলে। তারপর চিবুতে চিবুতে জিজ্ঞেস করে, 'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ?'

সুরঞ্জনা হাতের ঘড়িটা দেখে, 'খেয়াল করিনি তো। না বোধ হয়। অনেকক্ষণ হলে তো চা খেতাম, চানাচুর খেতাম, তোমার ওপর রাগ হতে থাকত।'

'চা খাও নি? তা হলে আগে এসো একটু চা-ই খাওয়া যাক', ওখানে দাঁড়িয়েই আলোক বাইরের দিকে তাকায় চা পাওয়া যায় কি না দেখতে। কোনো ট্রেন এসেছে, রাশি রাশি লোক তাদের দৃষ্টি আড়াল করে। আলোক ঘুরে বলে, 'ঐ ওদিকে একটা কফির দোকান ছিল না?'

সুরঞ্জনা হেসে বলে, 'আমি কি শেয়ালদা তোমার চাইতে বেশি চিনি? তুমিই তো হপ্তাবাবু।'

'হপ্তা না, হাফ-হপ্তা বাবু। আমার তো সপ্তাহে অন্তত দু-তিন-চারবার আসাই হয়। আমার কলিগরা ঠাট্টা করেন, কেন যে মিছিমিছি কোয়ার্টারটা আটকে রাখেন।'

'তোমার কোয়ার্টার তুমি নিয়েছ, তাতে অন্যদের মাথাব্যথা কেন?'

'একে ঠিক মাথাব্যথা বলা যায় না, সহকর্মী সম্পর্কে দুশ্চিন্তা। দুশ্চিন্তাও ঠিক নয়, বলতে পারো সহকর্মী সম্পর্কে কনসার্ন। এটুকু কনসার্ন না থাকলে আর এক সঙ্গে কাজ করে সুখ কী? তার ওপর তুমি একদিন গিয়ে সারাদিন ছিলে। সুতরাং সহকর্মীদের একটুকু স্বাস্থ্যকর কৌতূহল তো থাকতেই পারে। এখন চায়ের কথা বলো।' আলোকময় চানাচুরের ঠোঙাটা আবার সুরঞ্জনার সামনে ধরে। সুরঞ্জনা ঠোঙার ভিতর হাত ঢোকায়, কিন্তু ঠোঙাটা নেতিয়ে যায়। সে আলোকময়ের হাতের নিচে হাত দিয়ে ডান হাতে আঙুলগুলো ঠোঙার ভিতর ঢোকায়। আলোকময় ঠোঙাটা সুরঞ্জার হাতে ছেড়ে দেয় তারপর বলে, 'চলো, এগিয়ে দেখি।' এগোবার জন্যে আলোক ঘোরে। সুরঞ্জনা তার

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পাশে যায়, ঠোঙা হাতে। 'হ্যাঁ, ঐ দিকের স্টলটাতে তো আমরা অনেকবার কফি খেয়েছি', আলোকময় নিশ্চিত পা ফেলে।

সুরঞ্জনাও এগোতে এগোতে বলে, 'তার চাইতে ওপরের স্টলটাতে চলো না, দু'দণ্ড বসা যাবে, এক কাপের জায়গায় দু'কাপ চা-ও খাওয়া যাবে।'

'তার মানে তুমি আজ আর রাস্তায় বেরোবে না। এখান থেকেই ফিরতি বাস ধরবে', সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে আলোকময় বলে। আলোকময় একটু লম্বা পা ফেলে। তার একটু পিছন থেকে সুরঞ্জনা বলে, 'আহা-হা তা কেন, শেয়ালদার চা খেতে হলেই ঐ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গরম-করা চা জিভ পুড়িয়ে খেতে হবে কেন? আমরা কি এখন কোনো ট্রেন ধরব নাকি? তার চাইতে বসে-বসে এক কাপ ভালো চা খেতে খারাপ লাগে নাকি?'

'ওরা সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আলোকময় বলে, 'যাঃ, ওরা চা গরম করে দেয় না, সামনে বানিয়ে দেয়, ভালো, তুমি মিছিমিছি নিন্দা করছ, আর ওরা তো কফি দেয়।'

সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে সুরঞ্জনা বলে, 'কফি আমার ভালো লাগে না। তোমার আসলে এই ক্যান্টিনের চায়ের কথা কিছু মনেই নেই। ডেইলি প্যাসেঞ্জার আর সব কিছু গেছে। এখন কামরায় বসে তাস খেলা, আর ঘটি গরম খাওয়া আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাওয়া।'

'কামরার ভিতর হরিনাম সংকীর্তন বা দিল কেন?'

সুরঞ্জনা হেসে ফেলে, একটু হাঁপিয়েও ফেলে সিঁড়ি ভাঙতে, 'না, ওটা তো প্রমোশনের ব্যাপার। একদিনেই কেউ কি আর হরিনাম করতে পারে, ধীরে ধীরে এগোয়, তবে তোমার প্রোগ্রেস খুব ভালো।'

'কী রকম? কীসের প্রোগ্রেস?'

'পুরোপুরি ডেইলি প্যাসেঞ্জার হওয়ার দিকে। আজ যখন ট্রেন থেকে নেমে হেঁটে আসছিলে চানাচুর খেতে খেতে, কোনোদিকে না তাকিয়ে, যেন মনে হচ্ছিল স্টেশনটা তোমার ঘরবাড়ি। তোমার বয়সে অতটা বুড়োটেপনা মোটেই মানায় না।'

ওরা দোতলার বারান্দায় পৌঁছেছিল। সুরঞ্জনা একটু জোরে শ্বাস ফেলে নেয়। দোতলার এই ক্যান্টিনের সামনের বারান্দাটা ফাঁকা, আর কেউ নেই। আলোকময়ের ভালো লাগে। ক্যান্টিনের ভিতরটাও বেশ বড় আর টেবিলগুলো ফাঁকায় ফাঁকায় ছড়ানো। আলোকময় সামনে যে টেবিল পায় আর সেই টেবিলটাতেই বসে। টেবিলটা ঘুরে গিয়ে সুরঞ্জনা তার সামনে বসে। ব্যাগটা টেবিলের ওপর দেয়াল ঘেঁষে রাখে। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ঠোঁটের ওপরে ঘাম মোছে সুরঞ্জনা, তারপর রুমাল বের করে জুলফি দুটো আর কণ্ঠাটা মোছে। হাতের চানাচুরের ঠোঙাটা দুমড়ে-মুচড়ে গোল পাকিয়ে অ্যাশট্রের ভিতরে গুঁজে দেয়। আর তারও পরে যেন ঘরটাকে চোখ বুলিয়ে দেখে সে।

https://boierhut.com/fb

দেখে নিয়ে বলে ওঠে, 'এই টেবিলটাতে বসলে কেন? সবাই তো এই দরজাটা দিয়ে ঢুকবে।' সুরঞ্জনা সোজা হয়ে তার পছন্দের টেবিল খোঁজে।

আলোকময় বলে ওঠে, 'তাতে কী হলো। সবাই তো চা খেতে ঢুকবে, তাতে তোমার চা খাওয়ার অসুবিধে কী হবে?'

সুরঞ্জনা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, ডান হাত দিয়ে তার চেয়ারের মাথাটা ধরে সেটা সরিয়েছে, না তাকিয়ে পিছনে বাঁ হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা তুলে নিয়েছে, তারপর এক পা এগিয়ে বলেছে, 'ঐ টেবিলটাতে চলো।'

'কোন টেবিলের কথা সুরঞ্জনা বলছে তা আলোকময় বুঝতে পারে না, সে উঠে দাঁড়ায়। সে কোণের চেয়ারটাতে বসেছিল, তার পাশের চেয়ারটাকে একটু সরিয়ে তাকে বেরোতে হয়। ততক্ষণে সুরঞ্জনা এই টেবিলটার কোনাকুনি বিপরীত দিকের টেবিলটাতে গিয়ে পৌঁছেছে। এই টেবিলটাকে যদি বলা যায়—এ-ঘরে প্রথম টেবিল, তা হলে সুরঞ্জনার টেবিলটাকে বলতে হয় এ-ঘরের শেষ টেবিল। সুরঞ্জনা এই ঘরের দিকে পিছন ফেরানো যে চেয়ার দুটি পাশাপাশি ছিল, তার ভিতরটিতে গিয়ে বসে। দরজার দিয়ে যদি ঢোকে তা হলে সে সুরঞ্জনাকে এক নজর নাও দেখতে পারে। আলোকময় গিয়ে সুরঞ্জনার পাশের চেয়ারে মাথায় হাত দিয়ে বলে, 'কোথায় বসব?'

সুরঞ্জনা মুখ তুলে বলে, 'বসো, তোমার যেখানে খুশি, এ রকম দোকানে কি এই প্রথম ঢুকলে নাকি?'

আলোকময় সুরঞ্জনার সামনের চেয়ারটিতে বসতে বসতে বলে, 'না, তুমি যে রকম টেবিল বাছাই শুরু করলে, তাতে মনে হলো তুমি হয়তো বসারও কোনো একটা নিয়ম বানিয়েছ।'

সুরঞ্জনা হেসে ফেলে, 'না, ও-টেবিলটা একেবারে দরজার পাশে ছিল, এটাতে একটু আড়াল আছে, সবাই দূর থেকেই বুঝবে ও টেবিলে লোক আছে।'

'হ্যাঁ, তা বুঝবে, যতক্ষণ অন্য টেবিলে জায়গা থাকবে। যদি কোথাও জায়গা না পায় তাহলে কি তোমার এই দুটো চেয়ার খালি থাকবে না কী?' আলোকময় পাশের চেয়ার দুটি দেখায়।

সুরঞ্জনা হেসে বলে, 'তখন আমরা বেরিয়ে যাব।'

'আলোকময় হাসে, তার সেই বিখ্যাত আত্মসমর্পণের হাসি। আলোকময়ের দাঁতের সেটিং খুব ভালো। সে গম্ভীর থাকলে তাকে যেমন দেখায় হাসলে তার চাইতে অনেক ভালো দেখায় আর তার বয়সও যেন তাতে অনেকটা কমে যায়। সুরঞ্জনা বলে, 'তুমি যেন আজকাল কী রকম বুড়োটে হয়ে উঠছ, আলোক।'

'সে আবার কী? আমি যেমন তেমনই তো আছি, হঠাৎ বুড়োটে হতে যাব কেন?'

সুরঞ্জনা একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'কী যেন, ঠিক বোঝাতে পারব না। হয়তো এ রকম ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করলে মানুষ বুড়োটে হয়।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

‘এখান থেকে ইছাপুর একটা ডেইলি প্যাসেঞ্জারি হলো? কলকাতায় এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় যেতে কম সময় লাগে? ট্রেন যদি ঠিক রান করে তা হলে এটা আবার কোনো ব্যাপার? আলোকময় জোর দিয়ে বলে।

তিন

সুরঞ্জনা চুপ করে গেল। কথা ঘোরানোর জন্যে সে কথা খুঁজছিল, বলল, ‘ইছাপুর স্টেশনটা আমার ভালো লেগেছিল, অতটা ইট-বাঁধানো, মাথার ওপর কোনো চাল নেই, বড়-বড় গাছ?’

‘গাছ আছে নাকি? ইছাপুরে?’

‘গাছ নেই? এদিককার প্ল্যাটফর্মটায় যেদিকে অফিসটফিস?’

‘তুমি তো দুই নম্বর থেকে ট্রেন ধরেছিলে?’

‘হ্যাঁ, সেজন্যেই তো সামনে পড়ল প্ল্যাটফর্মটা, গাছ নেই? বড় গাছ?’

আলোকময় হাসে, ‘তুমি বোধ হয় গাছের মাথা দেখেছ?’

‘গাছ না থাকলে গাছের মাথা আসবে কোত্থেকে?’

‘না। গাছের মাথা তো দূর থেকেও দেখা যায়। সে-রকম কিছু দেখে হয়তো স্টেশনের গাছ ভেবেছ।’

‘তুমি সত্যি ডেইলি প্যাসেঞ্জার হয়ে গেছ, এই যাতায়াত করতে-করতে।’

‘আচ্ছা, এ-তর্কটা মুলতবি থাক। এটা অসমান তর্ক হয়ে যাচ্ছে। আমি ইছাপুরে থাকি আর তুমি ইছাপুরে একদিন গেছ—তর্ক হবে কী করে। তুমি যখন ইছাপুরে থাকবে তখন না হয় ইছাপুরের গাছের হিসেব কষা যাবে।’ বেয়ারা এসেছিল। আলোকময় বলে দেয়, ‘দুটো চা।’ সুরঞ্জনা তাড়াতাড়ি যোগ করে, ‘পটে দেবেন।’

‘পটে কেন?’

‘পটের চাটা ভালো হয়। গন্ধ পাওয়া যায়।’

‘তোমার আজকে চায়ে পেয়েছে?’

‘সুরঞ্জনা স্বীকৃতিসূচক হেসে যোগ করে, ‘তোমাকে দেখার পর পেয়েছে বা তোমার ঘটি গরম খাওয়ার পর।’

সুরঞ্জনা একটু আগে অসাবধানে তার হঠাৎ মনে হওয়া একটা কথা বলে ফেলেছিল। কথাটা এমন কিছু নয়। সত্যি, আজকাল কখনো-কখনো অন্যমনস্ক অবস্থায় আলোককে একটু বয়স্ক লাগে। আলোকের এখন সাতাশ চলছে। সামনের সাতাশে মার্চ ও আটাশে পড়বে। রোগা, লম্বা, এক মাথা

https://boierhut.com/fb

চুল, আলোকের লম্বা হওয়া যেন এখনো শেষ হয়নি—মুখটা এখনো কচি, গলাটা নিভাঁজ লম্বা। রোজ দাড়ি কামায় না আলোক। যেদিন কামায় সেদিন তার গালের ফরসা রং মুখের বাকি অংশের চাইতে একটু আলাদা হয়ে থাকে, খুব নজর করে দেখলে। কখনো-কখনো আবার মাসখানেক, মাসদুয়েক দাড়ি কাটে না আলোক, মাঝেমধ্যে ছেঁটে দেয় মাত্র, তাতে তার মুখটাতে একটা লম্বা টান ধরে। দু-এক সময় বলেছে সুরঞ্জনা, দাড়ি রাখতে। ঠিক পরদিনই দাড়ি কেটে হাজির হয়েছে আলোক। তখনো আলোককে যেন তার বয়সের মতোই ঠেকেছে। আলোকের মতো সুরঞ্জনাও অনিশ্চিত—আলোকের কোন মুখটা ভালো।

সুরঞ্জনা কথাটা বলে ফেলেছে বটে, কিন্তু কথাটা এমন বাড়াতে চায় না যাতে আলোক সত্যি ভেবে বসে সুরঞ্জনা এ রকম ভাবছে তা হলে আজকাল। কিন্তু আলোকের কাছ থেকে কথাটা গোপন করার অর্থ কি দাঁড়ায় না যে সুরঞ্জনার সত্যি করেই মনে হচ্ছে আলোক ভিতরে-ভিতরে তার বাইরের বয়স ছাপিয়ে উঠছে? পরিণতির একটা ধরন আলোকের মধ্যে বরাবরই ছিল আর সেটা তার বাইরের চেহারার সঙ্গে একেবারে মিলত না। যার কাছে তার এই পরিণতির ধরনটা ধরা পড়ত সে তার মুখ আর মনের এই বিরোধেই একটু চমকে যেত। সেই চমক থেকে অনেকে আবার আলোককে ভুলও বুঝেছে। আলোকের সঙ্গে প্রথম পরিচয় আর সাল-তারিখ দিয়ে মনে রাখে না সুরঞ্জনা, সে পরিচয় এতই স্থায়ী ও পরম পরিচয় হয়ে গেছে। তবু সেই পরিচয়ের ইতিহাসটা তো এই এখনকার দেখাশোনা, কথাবার্তা, বিনিময়ের মধ্যেও নিহিত আছে। সে তো আলোকের স্ত্রী। দু-বছর আগে তাদের রেজিস্ট্রেশন যদি নাও হতো, তা হলেও সুরঞ্জনা আলোকের স্ত্রী-ই থাকত। কথাটা আলোক বলেছিল, তার সেই পরিণত বুদ্ধিকে ভাষা দিয়ে সে যেমন হঠাৎ-হঠাৎ এমন কথা বলে ফেলে যার কোনো প্রতিবাদ হয় না বা যার কোনো বিরোধিতা করা যায় না।—'আমরা তো সব দিক দিয়েই স্বামী-স্ত্রী সুরঞ্জনা, সে আমাদের যতই কম দেখাশোনা হোক আর আমরা যতই কেননা আলাদা থাকতে বাধ্য হই। এখন আমাদের রেজিস্ট্রেশন করে জোর নেয়া দরকার। নইলে মনে হবে আমরা সম্পর্কটাকে এড়িয়ে যাচ্ছি, ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করছি।' এরপর সুরঞ্জনার কিছু বলার থাকতে পারে? বরং সেদিন তার মনে হয়েছিল—আলোক তো তাকে বহু বহু দিন সময় দিয়েছে, এ কথাটা তারই তো বলতে পারা উচিত ছিল, তারই তো আগে বুঝতে পারা উচিত ছিল আইনের সিলমোহর নয়, তাদের পারস্পরিক স্বীকৃতির জন্যেই তাদের রেজিস্ট্রেশন করা দরকার, অন্তত তাহলে দুজন দুজনার কাছে পরিষ্কার থাকতে পারবে। অথচ সে কথাটা বলে উঠতে পারল না। সুরঞ্জনা আজ আর মনে করতে পারে না—কথাটা তার মনে এসেছিল আর সে বলে উঠতে পারেনি নাকি কথাটা আদৌ আলোকের মতো স্পষ্টতায় তার মনে আসেনি? সুরঞ্জনার ভিতরে কোথাও একটা প্রস্তুতি না থাকলে সুরঞ্জনা সেদিন আলোকের এক কথায় রাজি হয়ে গিয়ে কী করে বলেছিল, তুমি সব ব্যবস্থা করো, তারপর কবে কোথায় যেতে হবে বলো।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সুরঞ্জনার চিন্তার এই জটিলতা থেকে নিজেকে ছাড়াতে চায়, এমনকি চিন্তার কোনো আঁচও সে আলোককে দিতে চায় না। সে অকারণে নিজের দুই হাত ঘষে ঝাড়ে, যেন চানাচুরের অবশেষগুলো ঝেড়ে ফেলছে। তারপর চোখ নামিয়ে, থুতনি নামিয়ে, স্বর একটু নিচু করে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার সেই রান্নার মেয়েটি আসছে তো?'

আলোক যেন আঁচটা পেয়েই যায়; সে একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'তার তো ওটা চাকরি, না এসে উপায় কী?'

আলোকের এইটুকু কথার ওপর নির্ভর করেই সুরঞ্জনা চিবুক তুলতে পারে, চোখ তুলতে পারে, গলাও তুলতে পারে। একটু হাসি মিলিয়ে বলে, 'চাকরি বলেই তো মুশকিল, আমরা সবাইই তো চাকরিতে ফাঁকি দিতে চাই'

'আমরা চাই। ফাঁকি দেইও, ওরা ফাঁকি দেয় না, ফাঁকি দিতে চায়ও না বোধ হয়।'

'কেন?'

'আমাদের তো চাকরি একবার হয়ে গেলে রিট্যায়ারমেন্ট পর্যন্ত চলবেই। ওদের চাকরি তো গুডউইলের ওপর। একবার যদি রটে যায় ও-লোকটি কামাই দেয় তা হলে কোনো বাড়িতে কাজ পাবে না।' আলোক একটু হাসে, আমরা অফিসে কলিগদের মুখ দেখেই বুঝে যাই কার বাড়িতে আজ কাজের লোক আসেনি। কাজের লোক না আসা মানে বাড়ির সব কিছু আপসেট। বাড়ির সব কিছু আপসেট মানে অফিসের সবকিছুই আপসেট। যার বাড়িতে কাজের লোক আসেনি, তার সেদিন অফিসে কাজ থেকে ছুটি।' আলোক আরো খানিকটা হাসে যেন সুরঞ্জনার মনের সন্দেহটা দূর করতেই, না, তার মনে কোনো আঁচ লাগেনি।

'তোমরা অফিসে খুব বাড়ির গল্প করো মানে তোমাদের অফিসে খুব বাড়ির গল্প হয়?' সুরঞ্জনা তার বাক্যটা সংশোধন করে বসে। যেন সুরঞ্জনার কোনো অফিস নেই, সেখানে কী গল্প হয় সে জানে না। আলোক তার কোয়ার্টারে থাকে বটে, কিন্তু তার তো সেখানে কোনো বাড়ি নেই, বরং এখানে তার মা-দাদা-বৌদির বাড়ি থেকে আলাদা হয়েই ওখানে আছে। আছে এই আশায় যে আজ হোক, কাল হোক, সুরঞ্জনা ওখানে গিয়ে এক ধরনের সংসার পাতবে। সে-সংসার অন্যদের মতো না হতে পারে, আলোক-সুরঞ্জনার মতোই হবে তবু তো একটা সংসার হবে। যদি ইস্কাপন আর তাতাও ইছাপুর যেতে রাজি হতো, তা হলে আরো এক রকমের সংসার হতো। ওদের না নিয়েও তো শুধু আলোকের আর তারও একটা বাড়ি হতে পারে, এখনো।

আলোক হেসে জানায় সে সুরঞ্জনার বাক্য-সংশোধন গায়ে মাখেনি, যেন বোঝেইনি। আলোকের এই ভঙ্গিগুলো সব চাইতে বিপজ্জনক। এমনকি, এখনো, এত বছর পরও আলোক সুরঞ্জনাকে ঠকিয়ে দেয়। সুরঞ্জনা নিশ্চিত হয়ে যায় যখন, তার অনেক পরে কোনো একদিন মধ্য রাত্রির

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নিদ্রাহীনতায় বা খুব সকালে ভাঙা ঘুমের মধ্যে টের পেয়ে যায়, আলোককে সে যা বোজাতে চায়নি আলোক সেসব অনেক বেশি করে বুঝে নিয়েছে।

এখন আলোক হেসে তার পাশের চেয়ারে এক হাতের ভর দিয়ে একটু এলিয়ে বসে। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এ রকমভাবে হে-হে করে হাসতে থাকে। সুরঞ্জনাও একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে, 'হলো কী?'

'যায়ই তিনটে জায়গায়—বাড়ি থেকে বাজার, বাজার থেকে বাড়ি, বাড়ি থেকে অফিস, অফিস থেকে বাড়ি, তা গল্প করার, চার নম্বর টপিক পাবে কোথায়?' আলোক হে-হে করে হাসতে থাকে আর বেয়ারা এসে টেবিলে ট্রে রাখে।

চার

সুরঞ্জনা ট্রেটা সঙ্গে-সঙ্গে টেনে নেয় না। বলে, 'তুমি একটা জিনিস বাদ দিলে।'

'কী। মাঝেমধ্যে সিনেমা? সে তো টিভির কল্যাণে উঠে গেছে, হ্যাঁ, টিভির গল্পও হয় কিন্তু সেটা তো বাড়ির গল্পের পার্ট। এর মধ্যে বাদ গেল কী?'

'খবরের কাগজ? দুজনেই এক কাগজ পড়েছেন তবু খবরগুলো এ ওঁকে বলবেন। কেউ কেউ আবার খবরের কাগজ ভাঁজ করা ব্যাগে ভরে নিয়ে আসেন। সেগুলো হাত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে পড়া হয়।' সুরঞ্জনা হাসে। আলোকময় সম্মতির হাসি হাসে, তার মুখে হাসিটা লেগেই থাকে, যেন এখন সুরঞ্জনাই বলবে, সে শুনবে। এই বিনিময়ের মধ্যে একই অভিজ্ঞতায় দুজনের সমান ভাগ ছিল। আলোকময় অন্য অফিসে কাজ করে, সে ইছাপুরে বদলি নিয়েচে, দরকার হলে পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও বদলি নিতে পারে। সুরঞ্জনার অফিস কলকাতাতেই আর তার যা চাকরি তাতে বদলির কোনো সম্ভাবনা নেই। তবু তারা দুজনেই তো সেই চাকরি করে থাকে এক সময় বলা হতো, কেরানির চাকরি, এখন যাকে আরো ব্যাপক একটা সংজ্ঞা দেয়া হয় 'হোয়াইট কলার্ড জব'। সে চাকরির ইতিহাস অনেক পুরনো। সেই ইতিহাসের সঙ্গে আধুনিক কালের একটা দ্বন্দ্বও হয়তো আছে। এখন এই ক্যান্টিনের টেবিলে বসে সুরঞ্জনা ও আলোকময় সেই ইতিহাসের ও বর্তমানের সহকর্মী ও সহচর হিসেবেই নিজেদের নিয়ে মশকরাতে মাতছিল। নিজেদের নিয়ে সেই হাসিঠাট্টার মধ্যে ট্রেটা টেনে নেয়।

সুরঞ্জনা পটের ঢাকনা খুলে চামচেটা দিয়ে ভিতরের জলটাকে নাড়িয়ে নেয়। তারপর আবার ঢাকনাটা দিয়ে একটা কাপের ওপর ছাকনি রাখে। ছাকনির ওপর চায়ের জল ঢালতেই একটা মৃদু

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

গন্ধ আলোকময়ের নাকে এসে লাগে। সে তার বসার ভঙ্গি বদলিয়ে নিম্নস্বরে বলে, 'ঠিকই বলেছ তো, একটা গন্ধ আসছে।'

সুরঞ্জনা চায়ে দুধ ঢালতে-ঢালতে বলে, 'তেমন কিছু নয়, এরা তো আর ভালো পাতি দেয় না তবু পটের কল্যাণে চা পাতিটা একটু ভালোভাবে ভেজে, তাই একটু গন্ধ পাওয়া যায়।'

সুরঞ্জনা কাপটা আলোকময়ের সামনে দেয়। আলোকময় কাপটা আরো সামনে টেনে নেয়। তারপর সেই গরম কাপেই একটা সাবধানী চুমুক দেয়। তত গরম নেই দেখে, প্রথম চুমুকটা ছোট করে নিয়ে আলোকময় দ্বিতীয় চুমুকটা লম্বা নেয়। ইতিমধ্যে সুরঞ্জনার নিজের জন্যে চা বানানো হয়ে গিয়েছিল। সে কাপটা সামনে রাখার জন্যে একটু ঠেলে ট্রেটা সরিয়ে দেয়।

ওরা দুজনেই চুপচাপ চা খেতে থাকে। আলোকময় হঠাৎ হেসে ফেলে, 'ভালো চা খাওয়ার একটা বিষয়ও?'

'ভালো চা সব সময় হাতের কাছে পাওয়া যায় না, এ যা বিপদ! আর অভ্যেস হয়ে গেলে অন্য চা খাওয়া যায় না এই আর-এক বিপদ।'

'না। আমি বলছিলাম ভালো চা এককাপ খেলে তারপরই আর-এককাপ খেতে ইচ্ছে হয় আর খারাপ চা খেলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুখটা তিতো হয়ে থাকে, চায়ের তেষ্টা পায় না।'

সুরঞ্জনা হেসে ওঠে। হাসিটা শেষ করতে-করতেই তার হঠাৎ মনে হয়, আলোকের ব্যাগে তো আজ সেই চিঠিটা আছে, আলোক তাকে দেবে, সে সই করে কাল অফিসে জমা দেবে। অথচ আলোক ট্রেন থেকে নামল ঘটি গরমের প্যাকেট হাতে, দেখা হতেই চা-খাওয়ার কথা বলল, এই ক্যান্টিনে এসে কেমন অলস ভঙ্গিতে বসে আছে, হঠাৎ-হঠাৎ নিজের মনে হেসে উঠে এক-একটা কথা বলছে—তাহলে কি আজ ও চিঠিটা টাইপ করে আনেনি। আলোকের চোখেমুখে কোথাও কোনো উদ্বেগ নেই। সে কি এই কারণে যে আলোক ভেবেছে, ঐ চিঠি নিয়ে তো আর নতুন করে কোনো কথা নেই, সে চিঠিটা দেবে আর সুরঞ্জনা কাল সকালে অফিসে সেটা জমা দেবে। তারপরে যা হবে, অফিসে বা বাড়িতে, তা তো তাদের দুজনকেই সামলাতে হবে, একা একাও বটে, একসঙ্গেও বটে। ঘটনাটা তো তাই, আলোকের পক্ষেও তাই, তা হলে সুরঞ্জনা আলোকের মতো নিরুদ্বেগ থাকতে পারে না কেন, বা সুরঞ্জানার মনে হচ্ছে কেন, আলোক ও-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ হয়ে আছে।

সুরঞ্জনা আবার উল্টো করে ভাবে, হয়তো এর বিপরীতটাই সত্য। চিঠিটা এখনও সুরঞ্জনার হাতে আসেনি, আলোক দেয়নি। চিঠিটা যদি টাইপ করে নিয়ে এসে থাকে আলোক, আনবেই-বা না কেন, আলোক হঠাৎ ঐ চিঠিটা টাইপ করে আনার কথাটাই ভুলে যাবে কেন, যদি ভুলে যায় তা হলে তো বুঝতে হবে আলোকের মনে অন্য কোনো ভাবনা এসেছে, আজ তো আসারই কথা ঐ

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চিঠির জন্যে; আজ তো সুরঞ্জনার হুইলারে দাঁড়ানোর কথা চিঠিটার জন্যে, তা হলে আর সব কিছু যথাযথ ঘটে হঠাৎ চিঠিটাই আনবে না কেন আলোকময়।

এক হতে পারে, আলোকময়ের হঠাৎ মনে হয়েছে, সুরঞ্জনাকে আরো কিছু সময় দেয়া দরকার। তেমন কোনো আভাস কি সুরঞ্জনা গত দিন বা তার আগের কোনো দিন, বা তারও আগের কোনো দিন, আলোকময়কে দিয়েছিল? সুরঞ্জনা মনে আনতে পারে না! মানে আনার খুব একটা চেষ্টা করার আগেই তার মনে হতে থাকে, এ রকম কোনো ভাবনা কি সে নিজেও কোনো সময় ভেবেছে? যদি ভেবে থাকে, তা হলে সে না বললেও আলোক তা জেনে যাবে। জেনে যায়। স্বামীর সঙ্গে যত দিনের দাম্পত্যে তার একটি মেয়ে ও একটি ছেলে হয়েছে, আলোকময়ের সঙ্গে তার দাম্পত্য তার চাইতে অনেক-অনেক বেশি দিনের দীর্ঘ। আলোকের সঙ্গে তার সেই দাম্পত্যে মনের এমন কোনো আড়াল তৈরি হতে পারেনি যে সুরঞ্জনা তার মনের ভাবনা মনেই গোপন রেখে দেবে। হয়তো, আলোকের সঙ্গে তার দাম্পত্য নানা বাধায় প্রকাশ্য সামাজিকতায় নিয়ে আসতে পারছে না বলে অস্থির হয়ে দু-এক সময় সে ভাবতে চেয়েছে—যেমন চলছে তেমনি চলুক, এখনই নতুন কোনো সংকটের মুখোমুখি সে আর দাঁড়াবার জোর পাচ্ছে না, আলোক তাকে আর-একটু সময় দিক বা সে আলোকের কাছ থেকে আর-একটু সময় নিক। কিন্তু সে ভাবনা তো জলের বুদ্বুদের মতো।

ভিতরে-ভিতরে সুরঞ্জনাই তো অস্থির হয়ে উঠেছে। তার বয়স একচল্লিশ হলো। মেয়েদের শরীর এই চারের কোঠাতেই বদলায়। সে-বদলের মানসিক প্রতিক্রিয়া আর কী হবে সে তা জানে না। তাছাড়া আলোক কিছু না বললেও সে কী করে আলোককে অতদিন অপেক্ষা করতে বলবে। সে অপেক্ষার অর্থ কী হবে। তার ছেলেমেয়ে তত দিনে আরো বড় হবে। তাদের তরফ থেকে বাধা তখন আরো প্রবল হতে পারে। শেষে কি মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিজের পূর্ব দাম্পত্যের কর্তব্য শেষ করে সুরঞ্জনা নিজের নতুন দাম্পত্যের ব্যবস্থা করবে। সুরঞ্জনা বরং আজকাল এ-কথাই বেশি করে ভাবে যে তারা বড় বেশি দিন অপেক্ষা করে ফেলল নাকি? এত বেশি দিন অপেক্ষা যার পরে সম্পর্কের আর নতুন হয়ে ওঠার ক্ষমতা থাকে না? তাদের কি উচিত ছিল দু বছর আগে রেজিস্ট্রেশনের সময়ই এই সম্পর্ক ঘোষণা করে দেয়া। কিন্তু তখন তো ইস্কাপনের হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা। আর তার এই সম্পর্কের ব্যাপারে ইস্কাপনের আপত্তিই সবচেয়ে বেশি। আলোক বা সুরঞ্জনা কেউই চায়নি, হায়ার সেকেন্ডারি পড়ছে যখন ইস্কাপন, তখন তাকে কোনোভাবে বিব্রত করতে। বরং তখন তো আলোক কত দিন সুরঞ্জনার কত অস্থিরতাকে ঠেকিয়েছে। আলোকের কাছে সুরঞ্জনার সেই ভঙ্গিটাই সত্য, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা সামাজিকভাবে স্বামী-স্ত্রী হয়ে যেতে চায়। আলোকের কাছে সুরঞ্জনার আতঙ্কগ্রস্ত বা পলায়নেচ্ছু কোনো ভাবনা কোনো প্রাধান্য পাবে না।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তা হলে কি সে-ই সুরঞ্জনাই, ভুল ভাবছে? অন্তত আজ আলোকময়ের ভিতর যে-বদল সে দেখছে বলে ভাবছে, তেমন কিছু আলোকময়ের ঘটেনি। সুরঞ্জনা যেমন মাঝে-মাঝে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তেমনি অকারণে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে? তেমনি অকারণেই তার কিছুক্ষণ আগে মনে হয়েছিল, এখনও মনে হচ্ছে—আলোকময় কেমন বুড়োটে হয়ে যাচ্ছে। আলোকের সেই আগের উচ্ছ্বাস বা অস্থিরতা যেন আজকাল নেই। সে, সুরঞ্জনাই কি আলোককে বুড়ো বানিয়ে দিল। আলোকের সঙ্গে যদি তার সমবয়েসি বা একটু ছোট কোনো মেয়ের সম্পর্ক হতো তা হলে সে তার যৌবন দিয়ে আলোককেও আরো যৌবনময় করে তুলতে পারত। সুরঞ্জনা কী করে ভুলবে সে আলোকের চাইতে চৌদ্দ বছরের বড়। তার এ-কথা আর এখন মনে থাকে না। এই কথাটা ভুলতেই তার সবচেয়ে বেশি সময় লেগেছে। তার বহু আগে সে আলোকের জন্যে স্বামী ভুলতে পেরেছে, ছেলেমেয়ে ভুলতে পেরেছে, সমাজ ভুলতে পেরেছে। কিন্তু নিজেকে ভুলতে পারেনি। নিজের মনকে ভোলা যায়, কিন্তু শরীরকে? এখনো যে তার মনে না এসে যায় না, এখনই যে তার মনে না এসে যাচ্ছে না, তার বয়সের ভারটা সে আলোকময়ের ওপর চাপিয়েছে। বা, সে না চাপালেও আলোকময় তার সাতাশ বছর বয়সটাকে যতটা সম্ভব ঠেলে তোলার চেষ্টা করছে সুরঞ্জনার একচল্লিশের দিকে। হয়তো তা নয়। কিন্তু সুরঞ্জনার যে মনে হচ্ছে আলোক বুড়োটে হয়ে যাচ্ছে কেন?

পাঁচ

সুরঞ্জনা নিজেকে দোষ দিতে গিয়ে আর থামাতে পারছে না। সে জানে, এটা তার মনের একটা ঝোঁক। আগে এই ঝোঁকটা সে প্রকাশ করে ফেলত আলোকময়ের সামনেই। তারপর আলোকময় কত যত্নে, কত কথায় সুরঞ্জনাকে এইটা বোঝাত যে তাদের ভিতর যে-সম্পর্কটা তৈরি হয়েছে সেটা নরনারীর মধ্যে সবচেয়ে স্বাভাবিক সম্পর্ক। কথার যুক্তিতে তারপর এ কথাও চলে আসত, সুরঞ্জনার একটা বিয়ে হয়েছিল বলে নরনারীর স্বাভাবিক সম্পর্কের সম্ভাবনা তো আর তার ক্ষেত্রে নাকচ হয়ে যেতে পারে না। কথার যুক্তিতে এ-কথাও আসত, সুরঞ্জনার স্বামী জীবিত থাকলেও তো তার আর সুরঞ্জনার মধ্যে এই সম্পর্ক তৈরি হতে পারত। কথার যুক্তিতে আরো কী কী কথা আসত, সে-ও সুরঞ্জনার জানা। আজ আর সেই সব কথার কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। আলোকময় যদি বোঝে সুরঞ্জনা আলোকের বুড়োটে হয়ে ওঠার জন্য নিজেকে দুষছে তা হলে সে তার আগের সেই সব কথাতে আজ আর ফিরে যাবে না। তারা সে-সব কথা পেরিয়ে আজ এখানে এসে পৌঁছেছে, যখন আলোকময় তার জন্যে চিঠি টাইপ করে নিয়ে আসে, সে কাল সকালে অফিসে গিয়ে সে চিঠি জমা দেবে। মানুষের স্বভাব তো তবু বদলায় না, সুরঞ্জনার স্বভাবও বদলাচ্ছে না। কিছুর মধ্যে কিছু

https://boierhut.com/fb

না, সে হঠাৎ আলোকময়কে বুড়োটে ভাবতে শুরু করল কেন আর তার জন্যে নিজেকে দুষতেই-বা শুরু করল কেন? এখন, এখনই যদি সুরঞ্জনা নিজেকে না ঠেকায় তা হলে এই ঠেলায় সে আরো অনেক কিছু ভেবে ফেলবে, শেষ পর্যন্ত আলোকের কাছে তাকে স্বীকার করতেও হতে পারে যে সে কী ভাবছিল। সুরঞ্জনা সেই সব কথা এখন তুলতে চায় না, সেই সব কথা এখন উঠুক, চায় না। সুরঞ্জনা জানে, এই মুহূর্তে সেই সব কথা ওঠা মানে তার সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা পরিবেশটাতে ছড়িয়ে পড়বে আর আলোকময় নিজের চরিত্রগুণে সেই ভুল ধারণা যে ভুল এটা প্রমাণ করবে। এমন হতে পারে যে আজকে এই কথাটা আর শেষ হবে না। তা হলে শেষ পর্যন্ত সুরঞ্জনা ও আলোকময়কে একটা শেষ না হওয়া কথা নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। আলোকময়ের হয়তো ধৈর্য আছে, সে আরো চব্বিশটি ঘণ্টার জন্যে নিজেকে সামলাতে পারবে, কিন্তু সুরুঞ্জনা পারবে না। যে আলোকময়ের সঙ্গে তার প্রতি মুহূর্তের বিনিময় ঘটার কথা, তার সঙ্গে একটা কথা চব্বিশ ঘণ্টার আগে শেষ হবে না—এই ব্যবস্থা সুরঞ্জনা মেনে নিতে পারে না। 'তোমার আমার শুধু কথা বলার জন্যেই তো মাঝেমধ্যে একসঙ্গে থাকার দরকার'—সুরঞ্জনা একবার যুক্তি দিয়েছিল। আবার এখন, এই মুহূর্তে তেমন কথার বিনিময় ঠেকাতে চায় সুরঞ্জনা, অথচ যত সময় যাচ্ছে ততই তার ভিতরে এই কথাটাই উথলে উঠছে। সুরঞ্জনা চায়ের কাপে ঠাণ্ডা চুমুক দেয়। একবার পটের ঢাকনা খুলে দেখে চা আছে কি না। আলোকময় জিজ্ঞাসা করে, 'আর-একবার চা নেবে, কি বেরোবে?

সুরঞ্জনা যেন নিজেকে সরিয়ে নেবার একটা অবলম্বন পেয়ে যায়, 'তুমি কি আজ ফিরে যাবে, নাকি বালিগঞ্জে থাকবে?

আলোকময় হাসে আর দু হাতের আঙুলগুলোতে একটা কাগজ গোল পাকায়। আলোকময় আবার সুরঞ্জনার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে, যেন হাসিটাই তার উত্তর। সুরঞ্জনা জিজ্ঞাসা করে, 'হাসছ যে! থেকে যাবে আজকে? বালিগঞ্জে?'

আলোকময় হাসির রহস্য আরো একটু বিস্তারিত করে বলে, 'আমি তো ভারতের স্বাধীন নাগরিক।'

এই জবাবটা শুনে সুরঞ্জনা খুশি হয়, তাদের মধ্যে একটা অনেক পুরনো সংলাপ, এ সংলাপ থেকে সুরঞ্জনা, এক সুরঞ্জনাই অনেক বেশি অর্থ বুঝে নিতে পারে। আলোক যে হঠাৎ তাদের দুজনের ভিতরই প্রচলিত কোনো এক ভাষা এমন হঠাৎ উচ্চারণ করল তাতে সুরঞ্জনা তার ক্ষণিক আগের একাকিত্বের অস্থিরতা থেকে সরে এসে আলোকের সন্নিহিত হয়ে যেতে পারে। সেও হেসে বলে, 'ভারতবর্ষটা আজ কোথায় যাবে—ইছাপুরে, না বালিগঞ্জে। জবাবটা দিতে পেরে খুশি হয় সুরঞ্জনা, সে একা হয়ে যাচ্ছিল, এখন কথার ওপর ভর দিয়ে আবার আসতে পারছে। সেই ফিরে আসার স্বস্তিতে সুরঞ্জনার আর-আশঙ্কা থাকে না যে এমনকি এই কথা থেকেও সে বিপাকে পড়ে যেতে পারে। আলোকময় সুরঞ্জনার জবাবে হেসে নিজের খুশি জানায়, তারপর নিজের জবাবটাকে

https://boierhut.com/fb

সেই খুশি থেকে বিযুক্ত করে বলে, 'তুমি তার কী বুঝবে, নারী, তোমার তো ভারতবর্ষ নেই, তোমার তো আছে এক দুই কুঠরিওয়ালা কোম্পানির কোয়ার্টার।'

'সুরঞ্জনা ঠোঁট ভেঙে জবাব দেয়, 'ওঃ কী আমার ভারতবর্ষওয়ালা রে, তোমারও তো সেই দুই কুঠরিওয়ালা কোম্পানির কোয়ার্টার?'

'আমি কি তা অস্বীকার করেছি? দশ ফুট বাই দশ ফুট', আলোক সুমনের গানের একটা কলি আওড়ায়, অর্ধেক সুরে, অর্ধেক আবৃত্তিতে, 'কিন্তু আমি ইচ্ছে করলে সেখানে ফিরতে পারি, আজ, সেখানে নাও ফিরতে পারি, বালিগঞ্জের বাড়িতে যেতে পারি, কোনো বন্ধুর বাড়িতে থাকতে পারি, এমনকি শেয়ালদা স্টেশনেও রাত কাটাতে পারি। তুমি তো আর তা পারবে না। তোমাকে তারাতলার কোয়ার্টারে ফিরতেই হবে। বড়জোর একটু বেশি রাত করে ফিরলে। তোমার স্বাধীনতা ঐ পর্যন্তই।'

'আর তোমার স্বাধীনতা?'

'কাল সকাল আটটা পর্যন্ত', আলোকময় হে-হে করে হাসতে থাকে, 'অফিস। কিন্তু তার আগে তো এতগুলো ঘণ্টা ভারতের এই সুসন্তান কারো অধীন নয়, স্বাধীন, স্বাধীন।'

'দেখো, এত স্বাধীন-স্বাধীন করো না, কে কত স্বাধীন আমার জানা আছে। এখন বানিয়ে বানিয়ে বলছ কোনো বন্ধুর বাড়িতে থাকতে পারো, সে তো আমিও বাড়িতে একটা ফোন করে সুষমাদির বাড়ি চলে যেতে পারি, নোটনমাসির বাড়ি চলে যেতে পারি—'

'ওসব মালতীদি, নোটনমাসিটাসি দিয়ে কি আর স্বাধীন হওয়া যায়? ও আরো পরাধীনতা। প্রথমে বাড়িতে ফোন করো, সাতকাহন বোঝাও, তারপর আবার মাসি বা দিদিকে ফোন করো, সাতকাহন বোজাও, তাকে স্বাধীনতা বলে? তুমি পরাধীন, তুমি পরাধীন, তুমি ভীষণ রকম পরাধীন, আমি স্বাধীন।'

আলোকময়ের এই কথার কি আর-কোনো ইঙ্গিত আছে? আলোকময় কি এ-কথা বলতে চায় যে সুরঞ্জনার জন্যেই তাদের বিবাহের ঘোষণা এ রকম পেছিয়ে যাচ্ছে? আলোকময় কি এই কথাও বলতে চায় যে সুরঞ্জনা তার মেয়ে ইস্কাপন আর ছেলে তাতার অধীন, এত অধীন যে তা থেকে সে স্বাধীন হতে পারছে না। কিন্তু তেমন কোনো কথা কি ইঙ্গিতেও বলতে পারে আলোকময়? সে-রকম কথা বলা তো আলোকময়ের স্বভাব নয়। তা ছাড়া আলোকই তো অতীতে কোনো-কোনো সময় ইস্কাপন আর তাতার কথা বলে তাকে ঠেকিয়েছে। তা হলে আলোক কি ইঙ্গিতে এখন এই কথা বলতে পারে? না, আলোক ইঙ্গিতে কোনো কথা বলেনি, তাদের দুজনের নিজস্ব ভাষায় আলাপ চলছে মাত্র। এর অতিরিক্ত কোনো অর্থ এই কথার নেই। সুরঞ্জনা বলে ওঠে, 'যতদিন নিজের কোয়ার্টার একটা না-জুটেছে ততদিন তো এই বালিগঞ্জ থেকেই রোজ ইছাপুরে স্বাধীনতা করতে হয়েছে। আর এত বছরে তো এক রাত্রিও কোনো বন্ধুর বাড়িতে রাত কাটানোর কথা শুনিনি।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এমন এক কোয়ার্টার পেয়ে উনি স্বাধীন হয়েছেন। হয় বালিগঞ্জে যাবে, না-হয় ট্রেনে চেপে ইছাপুরে যাবে, ভারী স্বাধীন।'

'আচ্ছা, তুমি মনে-মনে একবার হিসাব কষো, তোমার চেনাজানা কারো এইটুকু স্বাধীনতা আছে কি না, হয় কলকাতা, না-হয় ইছাপুর, এইটুকু স্বাধীনতাও আছে কি না, ভাবো।'

সুরঞ্জনা ভুরু কুঁচকে ভাবনার ভঙ্গি করে। একটু পরেই হেসে ফেলে। আলোকময় জিজ্ঞাসা করে, 'হাসলে যে, হিসেব কষেছ?'

'হিসেব কষেছি এবং জবাব পেয়েছি।'

'কী জবাব, বলো।'

'তোমার মতো সব হপ্তাবাবু বা হাফ-হপ্তাবাবুই ভারতের স্বাধীন নাগরিক। তারা যে-কোনো দিন বাড়ি ফিরে আসতে পারেন আবার সকালবেলা গিয়ে অফিস করতে পারেন।

'রাইট। আমার মতো হপ্তাবাবুরাই ভারতের স্বাধীন নাগরিক।'

ছয়

'তোমার এ রকম গর্বের বিষয় আর কী কী আছে তার একটা লিস্ট করে দিও।'

'এর কি আর লিস্ট হয়, হঠাৎ-হঠাৎ যখন গর্ববোধ হয় তখন মনে পড়ে যায়।'

'এখন তোমার হপ্তাবাবু বলে গর্ব হওয়ার কারণ?'

'কারণ এই শেয়ালদা স্টেশন, এই ক্যান্টিন, এই চা এবং তুমি।'

'তার সঙ্গে হপ্তাবাবু কী?'

'আমি হপ্তাবাবু না হলে কি আর আমাদের মিটিং প্লেস শেয়ালদার হুইলার হতো। আমি যদি হাওড়া লাইনের হপ্তাবাবু হতাম তা হলে আমাদের মিটিং প্লেস হতো বড়ঘড়ির তলা।' সুরঞ্জনা খিলকিল করে হেসে ওঠে, শেষের কথাটা তার প্রত্যাশার মধ্যে ছিল না।

'আচ্ছা এর উল্টোটাও তো হতে পারে, মানে, হতে পারত', হাসির গলায় সুরঞ্জনা বলে।

'এ আবার উল্টো কী? শেয়ালদায় যদি বড়ঘড়ি থাকত আর হাওড়ায় যদি হুইলার থাকত। আছে তো? শেয়ালদর ঘড়িতো বাস থেকেও দেখা যায় আর হাওড়ার হুইলার তো বেশ বড়।

'ধূত। তুমি শুধু নিজের কথায় আছ। আমি বলছি, তোমার বদলে আমিও তো হপ্তাবাবু হতে পারতাম।'

'পারতাম বলছ কেন? তোমাকে তো খানিকটা হপ্তাবাবু হতেই হবে যদি ইছাপুরের কোয়ার্টারে এসে মাঝেমধ্যে থাকো। সে তো পরিস্থিতি কী দাঁড়ায় তার ওপর নির্ভর করে।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'সে তো পরের কথা। আমি বলছি আজও তো আমি তোমার জন্যে শেয়ালদায় না দাঁড়িয়ে ইছাপুর চলে যেতে পারতাম, তারপর ইছাপুর থেকে ফিরে আসতাম।'

'হ্যাঁ, তা পারতে, কিন্তু ইছাপুরে তো এ রকম বসার জায়গা পেতে না।'

'আমরা কি রোজই বসি? আমরা তো বেশিরভাগ দিনই হাঁটি। ইছাপুরেও হাঁটতাম।'

'তা একদিন হাঁটলেই হবে।'

'না, এ-কথাটা আমাদের কখনো মনে হয় না কেন?'

'সে হয়তো হতো যদি আমি কলকাতায় থাকতাম আর তুমি ইছাপুরে থাকতে।'

'তুমিই তো বললে ইছাপুর তেমন দূরে নয়, এমনকি ডেইলি প্যাসেঞ্জারিও বলা যায় না।'

'আমাদের দেখা হয়েছে কটায়?'

'সোয়া ছটা-সাড়ে ছয়টা নাগাদ।'

'তুমি ইছাপুরে গেলে সাতটা, বড়জোর সাড়ে সাতটার মধ্যেই কলকাতায় ফিরতে চাইতে। আমাকে তোমার সঙ্গে আসতে হতো। তোমাকে শেয়ালদা থেকেই কোনো বাসে তুলে দিয়ে আমাকে আবার ফিরতে হতো। সেটা কি খুব সুবিধাজনক হতো? তবে তাই বলে তুমি দু-একদিনও ইছাপুরে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না, তা নয়।'

খানিকটা এ রকম কথা বলে ওরা নিজেদের ব্যাপৃত রাখে। এ রকম কথা আরো বলে যাওয়া যায়, তেমন হলে ওরা বলে, আজও বলবে। এই কথাগুলো বলার সময় ওদের ভিতর একটা বিস্মরণ কাজ করে। কিছুতেই ওরা এমন কোনো প্রসঙ্গ তোলে না যাতে কথার এই বিনিময় থেমে যেতে পারে। এমনটা যে বরাবর ঘটে আসছে, তা নয়। কিন্তু ওদের সম্পর্কটা তো অনেক দিনের। অনেক প্রসঙ্গ, প্রসঙ্গান্তর, বিপত্তি, সংকট ওরা পার হয়ে এখানে পৌঁছেছে। এক সময় ছিল, যখন ওরা প্রায় প্রতিদিনই কথা বলতে সেই সব প্রসঙ্গ, প্রসঙ্গান্তর, বিপত্তি ও সংকট নিয়ে। অফিসে সুরঞ্জনাকে নিয়ে কানাঘুষো চলছে—একসময় এটা নিয়মিত প্রসঙ্গ ছিল। তখন তো আলোকময় কলকাতাতেই থাকত। তাদের রোজ দেখা হতো—এমনও নয়। কিন্তু এই সব প্রসঙ্গ, প্রসঙ্গান্তর, বিপত্তি ও সংকট নিয়ে কথা বলতে-বলতে তাদের দেখা হওয়া নিয়মিত হয়ে ওঠে। তারও আগে একসময় ছিল, যখন আলোকময় প্রায় নিয়মিত সুরঞ্জনার কোয়ার্টারে যেত। তখন ইস্কাপন কতটুকু, তাতা তো আরো ছোট। মনে হতো আলোকময় ইস্কাপন আর তাতার কাছেই যেত। ইস্কাপনকে একটু পড়াটড়াও দেখিয়ে দিতো আলোক, সেও গল্প করতে-করতেই। ওরা যেন আলোক কাকাকে ছাড়তে চাইত না। সেই সময়টাই কি সবচেয়ে সুন্দর নির্বিঘ্ন সময় ছিল, যখন কারো ভিতরই কোনো সন্দেহ ছিল না আর যখন একটু-একটু করে সুরঞ্জনা অবধারিত এক ভবিষ্যতের মতো আলোকময়কে ভালোবেসে ফেলছে। তখন সন্ধে হতে না-হতেই তাদের বাড়ির তিনজনেরই, সুরঞ্জনা-ইস্কাপন-তাতা তিনজনেরই ছিল আলোকময়ের জন্যে প্রতীক্ষা। কতটুকুই-বা কথা হতো

https://boierhut.com/fb

তাদের দুজনের? কোনো-কোনো দিন হতোই না। তার কোনো-কোনো দিন সুরঞ্জনা পায়ে-পায়ে আলোকময়কে বাস পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসত। অথচ সারা দিন ধরে যেন প্রতিনিয়ত সুরঞ্জনার সঙ্গে আলোকময়ের কথা চলত, সে কথা সন্ধেয় আলোকময়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর শেষ হতো না, রাত্রে আলোকময় চলে যাবার পরও থামত না। তারও পরে একসময় এলো, যখন ইস্কাপন কোয়ার্টারের পাড়ায়, তার সমবয়সিনী বন্ধুদের কাছে, কখনো-বা বন্ধুদের মায়েদের কাছেও কী সব কথা শুনে কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। অথচ আলোককাকাকে অস্বীকার করার মতো মনের জোরও তার ছিল না। আলোক এলে সে একটু-আধটু এড়িয়ে চলতে চাইত, শেষে না পেরে হার মানত। কিন্তু বেশ কিছুদিন এমন চলার পর আলোককেও দু-একদিনের হার মানতে হলো। ইস্কাপন সুরঞ্জনার সঙ্গে বিচ্ছিরি ব্যবহার শুরু করল। এই সব কথা আলোককে বলা যেন আলোকের সঙ্গে ফোনে সময় ও জায়গা ঠিক করে দেখা করতে হতো। যে-আলোক ছিল সুরঞ্জনার ঘরে, সে-আলোক এসে দাঁড়াল কলকাতার মাঝখানে। সুরঞ্জনা যেদিন আলোকের সঙ্গে দেখা করতে যেত সেদিন আলোক-সুরঞ্জনা হয়তো একসঙ্গেই কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসত সুরঞ্জনার কোয়ার্টারে। আবার কখনো, একটু বেশি সময় বাইরে থাকা হয়ে গেলে, আলোক আর কোয়ার্টার পর্যন্ত আসত না, সুরঞ্জনা একাই ফিরে আসত।

তারও পরে কোনো একসময় ইস্কাপন আপত্তি তুলেছিল, মা কেন রোজ অফিস থেকে ফিরে আসে, আবার বাইরে বেরুবে? ততদিনে আলোকময়কে নিয়ে সুরঞ্জনার সব প্রতিরোধ ভেঙে গেছে। ইস্কাপন যদি অতটা খারাপ ব্যবহার সুরঞ্জনার সঙ্গে না করত, ইস্কাপন যদি সুরঞ্জনাকে আলোকময়ের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা না করত, তা হলে হয়তো, তখনই, সেই সময়ই, সুরঞ্জনা ও-রকম গত্যন্তরহীন হয়ে আলোকের দিকে চলে যেত না। তা হলে হয়তো আলোকের দিকে চলে যাবার পথে সে নিজেই কতকগুলো দুরতিক্রম্য বাধা তৈরি করে তুলত। ইস্কাপন বোধ হয় তখনই, বা তখন থেকেই, তার বন্ধুদের ও তার কোনো-কোনো বন্ধুর মাকে তার নিজের মায়ের চাইতে বিশ্বাস করত বেশি। তারা বোধ হয় শিখিয়েও দিত, মাকে ইস্কাপন কী বলবে, আলোককে কী বলবে। এ রকম একটা শিখিয়ে দেয়া কথাই একদিন ইস্কাপন বলে দিল, তুমি আর আমাদের বাড়িতে এসো না, তুমি তো আমাদের জন্যে আসছ না, মার জন্যেই আসছ, তোমাকে আর এই মিথ্যে অভিনয় করতে হবে না। ইস্কাপন আলোককে সরাসরি এতটা অপমান না করলে সুরঞ্জনার জীবনের পক্ষে আলোক এমন অনিবার্য হয়ে উঠত না। তখন তো তাদের টেলিফোনেও কথা বলতে হতো, তারপর অনেক দিন আলোককে সুরঞ্জনার অফিসে এসেও দেখা করতে হয়েছে, অফিসের পর সুরঞ্জনাকে তো যেতেই হতো কোনো-কোনো দিন। সেই একসময় গেছে—যখন দেখা না করে চব্বিশ ঘণ্টাও তারা কাটাতে পারত না; চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই যেন সংকট দেখা দিত। তখন তাদের অনেক কথা বলতে হয়েছে। তার পরও আরো একসময় সুরঞ্জনা

https://boierhut.com/fb

ইস্কাপনের ভবিষ্যৎ নিয়েই চিন্তিত হয়ে পড়ল। সে যে সুরঞ্জনাকে এত খারাপ ভাষায় আক্রমণ করতে পারে, তার মানে তো সেই খারাপ চিন্তাগুলোর মধ্যেই সে দিনরাত থাকছে। তাই যদি ও থাকে তা হলে ও পড়াশুনোর কথা ভাববে কখন, ভাববে কী করে। সে-সময় ইস্কাপন বোধ হয় নাইনের মাঝামাঝি পড়ে। এ সমস্যা নিয়েও তো আলোকের সঙ্গেই তাকে কথা বলতে হয়েছে। সুরঞ্জনা কিছু ঠিক করতে পারেনি, আলোকই জোর দিয়ে ঠিক করেছিল, সে আর সুরঞ্জনার কোয়ার্টারে যাবে না, তাতে অন্তত পাড়া-পড়শির কথা থেকে ইস্কাপন বাঁচবে। আর অফিসের পরও সুরঞ্জনা রোজ আলোকের সঙ্গে দেখা করতে বেরোবে না। তাতে ইস্কাপনের অন্তত এটুকু তৃপ্তি জুটবে যে তার জেদই বজায় থাকল। আলোকময়ের কথা ষোল আনা ফলে গেল। ইস্কাপনও বোধ হয় ভিতরে-ভিতরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে এই জয়ে শান্ত হয়ে গেল, তারপর পাড়ার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ বা তাদের বাড়িতে যাওয়া, ছেড়ে দিল। ফোনে কথা হতো আলোকের সঙ্গে সুরঞ্জনার। কিন্তু আলোকের সঙ্গে সেই বাধ্যত অসাক্ষাতেই সুরঞ্জনা বুঝতে পেরেছিল, আলোকের সঙ্গে তার সাক্ষাতের টানটা কী নিবিড়। একদিনে বুঝতে পেরেছিল, তা নয়, দিনে-দিনে বুঝতে পেরেছিল। প্রতিদিন বুঝতে পারছিল। তখনও তাদের নিজেদের নিয়ে কথা বলা বাকি ছিল।

সাত

সেই আর-এক সময় গেছে যখন কলকাতার যেখানেই হোক ওদের দুজনের দেখা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কলকাতার ফুটপাথ থেকে কথা ফুটত আতশবাজির মতো, কলকাতার আকাশ থেকে কথা ঝরত ঝরে পরা হাউইয়ের মতো। জীবনের কোনো একটি কথাও যেন পরস্পরকে না-জানানোর নয়। বাড়িঘরের কথা, অফিসকাছারির কথা, পাড়াপড়শির কথা, বন্ধুবান্ধবের কথা, সকাল রাতের কথা, যাতায়াতের কথা, বসে থাকার কথা, শুয়ে থাকার কথা, ছেলেমেয়ের কথা, ছেলেমেয়ের বন্ধুদের কথা, ছেলেমেয়ের স্কুলের কথা—কোন কথা থেকে যে কোন কথা উঠে আসত আর কখন সে কথা জলের মধ্যে জলের মতো মিলিয়ে যেত, তা ওদের দুজনের কেউ টেরটিও পেত না। যেন চব্বিশ ঘণ্টা বাধ্যত নীরব রাখার পর ওদের দুজনকে শুধু দুজনের সঙ্গে কথা বলার জন্যেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তখন ওদের দুজনের দেখা হওয়া মাত্র মনে হতো সকাল হচ্ছে আর সারা রাতের নীরবতার পর পাখিরা একসঙ্গে ডাকতে শুরু করবে। তারা যেখানে দাঁড়িয়ে বা বসে কথা বলত, সে কোনো রাস্তার মোড়ই হোক, আর একটা শুকনো পার্কের ভেঙে পড়া বাঁকানো রেলিঙই হোক, বা কোনো সমাধিক্ষেত্রের ভেঙে পড়া তোরণই হোক, বা 'এই বাড়ির সব পুরনো দরজা, জানালা, কড়িকাঠ ইত্যাদি বিক্রয় হইবে' সাইনবোর্ড টাঙানো কোনো ছাদ ভেঙে ফেলা বাড়ির খাড়া দাঁড়িয়ে

https://boierhut.com/fb

থাকা কলামগুলোই হোক, বা কোনো ময়দানের এক কোণ থেকে আর-এক কোণ পর্যন্ত বিস্তারিত ঘাসই হোক, বা গঙ্গার পাড়ের কোনো ঘাটের ভাঙা সিঁড়ি হোক, গঙ্গার পারে খুব কাছাকাছি নোঙর করা নৌকোর গলুই হোক, বা গঙ্গার প্রায় পাড়ে কোনো মদনমোহন মন্দিরের চাতাল হোক, বা উনিশ শ পঁয়ষট্টি সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জেতা প্যাটন ট্যাঙ্কই হোক, বা রেড রোডের রাস্তার রেলিঙই হোক, বা প্রীতিলতা অথবা আম্বেদকরের মূর্তির নিচের সমতল জায়গাই হোক, বা দুর্গের র‍্যামপার্টই হোক, বা কোনো হাসপাতালের বিরাট চওড়া সিঁড়ির একটা কোণ হোক, বা সেই হাসপাতালের বাগানের একটা সবুজ বেঞ্চই হোক, বা কোনো ঘিঞ্জি চায়ের দোকানের একটা নোংরা কেবিনই হোক, বা প্যারীচরণ সরকার স্ট্রিট আর কলুটোলার মধ্যে একটা বর্গক্ষেত্রই হোক, বেলেঘাটা সিআইটি দিয়ে সুভাষ সরোবরের পাশ দিয়ে বাইপাসের দিকে চলে যাওয়া রাস্তাই হোক, বা কোথাও হঠাৎ প্যান্ডেল খাটিয়ে শুরু করা বিজ্ঞান মেলাই হোক, বা শেয়ালদার গাছের চারা বিক্রির বাজারই হোক, বা তিন নম্বর রেল ব্রিজ ডিঙিয়ে খোলা বাজারের রাস্তাই হোক, বা পার্ক সার্কাস রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মই হোক, বা সিমলে থেকে হাতিবাগান থেকে বাগবাজার পর্যন্ত বিস্তারিত অসংখ্য গলিঘুঁজিই হোক—সেখানেই তাদের পায়ে-পায়ে কথা ফুটে উঠত, শুধু ঠোঁটে কথা না বলে, তাদের হাতের দশ আঙুলে কথা ফোটাতে হতো।

তখনই একটা সময় গেছে যখন সুরঞ্জনা নিজের বয়স ভুলে গিয়েছিল, তার সঙ্গে আলোকময়ের বয়সের তফাৎ ভুলে গিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল অথবা হিসেবে রাখেনি। কলকাতায় রাস্তায়-রাস্তায় হাঁটার জন্যে আর বয়সের হিসেব কে রাখে। অথবা সেই একসময় গেছে যখন আলোকময়ের বয়সের টানে সুরঞ্জনার বয়স কমে কমে গেছে, যতটা কমা দরকার ততটাই কমে গেছে। বা, সুরঞ্জনার সঙ্গে আলোকের বয়সের তফাতের আড়ালটা প্রতিদিন বেশি-বেশি অবান্তর হয়ে গেছে। তখন তাদের কথার উৎস আর তাদের বেঁচে থাকার উৎস একই ছিল। তখন তারা কথা বলছিল আর বেঁচে থাকছিল।

আর সেই কথা বলা আর বেঁচে থাকার মধ্যেই পশ্চিমাকাশের লালের ওপর কাল মেঘোদয়ের মতো দিগন্ত ব্যেপে জেগে উঠেছিল শরীর। তারা কোথা থেকে কোথায় হাঁটছে, তারা কোন কথা থেকে কোন কথায় যাচ্ছে, তারা একদিন থেকে আরেক দিন কেমন বাঁচছে—এ-কোনো মানচিত্রে যেন স্পষ্ট আকার নিচ্ছিল না যতক্ষণ-না শরীর তার মীমাংসা করে দেয়। এমন নয় যে শরীরগুলো ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই কথা আর এই কলকাতা শহরে চংক্রমণ, আকার দিচ্ছিল, জল-রোদ-হাওয়া মিলে যেমন আকাশে বৃষ্টিবজ্রগর্ভ মেঘকে আকার দেয়। দুই মেঘখণ্ডের মতোই ছিল তাদের স্বাধীন সঞ্চরণ, কিন্তু সেই স্বাধীনতার মধ্যেই সেই দুটি বজ্রবৃষ্টিগর্ভ মেঘ পরস্পরের দিকে নির্ভুল গতিতে এগোচ্ছিল। সেই গতি কোথাও ব্যাহত হতে পারত না—আকাশের মতো ব্যাপ্ত কলকাতা ছিল পায়ে-পায়ে, বাতাসের মতো স্বাধীন কথা ছিল মুখে-মুখে। আলোকময় কখনো কোনো

https://boierhut.com/fb

দাবি তুলে ঘটনাটিকে অনিবার্য করে তোলেনি। সুরঞ্জনাও কি আলোকময়ের মতোই নিশ্চিত বুঝছিল না যে তাদের শরীরোদয় ঘটে যাচ্ছে। তাদের কোনো অভিসন্ধি ছিল না, কোনো আয়োজনও ছিল না। সেই একসময় এলো যখন দুজন দুজনের শরীর থেকে নিজের শরীরকে শরিয়ে আনার চেষ্টা করল। সেই একসময় ছিল যখন তাদের দুজনের কেউই নিশ্চিত ছিল না, নিজের শরীরের ভিতর আর-এক শরীরের এই জাগরণ অন্যের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে কি না। তারপর সেই একসময় এলো যখন তারা দুজনই দেখে অনেক খাড়াই ভেঙে, অনেক পাথরের দেয়াল উতরে, অনেক তুষারপ্রান্তর পেরিয়ে তারা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেটাই পর্বতশীর্ষ, সামনে আর-কোনো শিখর নেই। তারপর সেই একসময় এলো যখন একজনের প্রস্তাবনা আর-একজন প্রত্যাখ্যান করার পরই সে-ই আবার নতুন প্রস্তাবনা তৈরি করে তোলে। সেই একসময় এলো, যখন তাদের দুজনের ভিতর অন্য ভাষাগুলো স্তব্ধ হয়ে গেল, তারা দুজন দুজনের সঙ্গে শরীর দিয়ে শরীরের ভাষায় কথা বলে উঠল। শরীর শরীরের ভাষা বুঝে নিল। শরীর শরীরের ভিতরে নতুন ভাষা বুনে দিল। তাদের ভাষার অর্থ এর পরে বদলে গেল।

সুরঞ্জনাকে প্রথমে তার শরীরের ভাষাতেই জানতে হয়েছিল যে সে একবারের বৈধব্য সহ্য করতে পেরেছে নিজের দিকে তাকিয়ে, নিজের দুই শিশু সন্তানের দিকে তাকিয়ে। তা ছাড়া দাম্পত্য কী তা হয়তো সত্তা দিয়ে বুঝে ওঠার আগেই তাকে জানতে হয়েছিল বৈধব্য কী। তাই সেবার তার এই দুই জানাতেই ফাঁক থেকে গিয়েছিল। সে দ্বিতীয় বৈধব্য সহ্য করতে পারবে না, নিজের দিকে তাকিয়েও না, নিজের বড় বড় ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়েও না। আলোককে যদি সে না পায়, আলোক যদি তাকে ছেড়ে চলে যায়, আলোকের সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি যদি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে— তা হলে সুরঞ্জনা বাঁচবে না। সুরঞ্জনা এমন সরলভাবে তার বয়সে পৌঁছয়নি যে সে আলোকের প্রতি তার প্রাথমিক টান বোধ না করে একেবারেই পরম টান বোধ করবে। কিন্তু সুরঞ্জনার নিজের অসরল জীবন থেকেই সে হয়তো এটা বুঝে গিয়েছিল যে প্রাথমিক টান থেকে পরম টানে পৌঁছুবার সব স্তর অতিক্রম করে আলোকের আর তার জীবন গড়ে উঠবে না। হয়তো তার অপেক্ষাও ছিল এই সম্পর্ক সেই পরম নির্ভরতার দিকেই যায় কি না। সেই মীমাংসা সুরঞ্জনার শরীরই ঘটিয়ে দিল।

সেই চরম মীমাংসার পরও একটা সময় এসেছিল যখন সুরঞ্জনার বয়সটাই সুরঞ্জনার কাছে বাধা হয়ে উঠেছিল। আলোকময়কে তখন সুরঞ্জনা এক একাকী আত্মচিন্তার শেষে একদিন বলেছিল, কে জানে আমি তোমাকে বাধ্য করলাম কি না, কে জানে আমি তোমার জীবনটাকে আটকে দিলাম কি না। আমাদের বয়সের তফাত এত বেশি, এতই বেশি, আমি তোমার চাইতে বয়সে এত বড় যে কোনো কিছু দিয়ে তার ব্যাখ্যা চলে না। তোমাকে তোমার জীবন থেকে আমি সরিয়ে আনলাম, আলোক। এতে যদি শেষ ভালো না হয়!

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আলোকময় ধৈর্য ধরে ধীরে-ধীরে অনেকটা সময় নিয়ে সুরঞ্জনার এই সংকট কাটিয়ে দিয়ে দিয়েছে। আত্মত্যাগের মোহ থেকে সুরঞ্জনাকে সরিয়ে এনেছে। আর সেই প্রক্রিয়াতেই আজ থেকে দু বছর আগে তারা তাদের বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে নিয়েছে। পরস্পরের সম্পর্ক থেকে যে পরিত্রাণহীনতায় তারা নিজেরাই নিজেদের বেঁধেছে, তারই যুক্তিতে এখন তারা অপেক্ষা করে আছে, কবে কখন তারা এই কথাটা ঘোষণা করতে পারবে যে তারা, সুরঞ্জনা ও আলোকময় স্বামী-স্ত্রী, তারা তাদের দাম্পত্য যাপন করেছে ও করবে।

এমনকি রেজিস্ট্রেশনটাও নাটকীয় কিছু ছিল না। দুই সাক্ষীসহ তারা এক ঘিঞ্জি অফিসে গিয়ে মিনিট পনেরোর মধ্যে কাজ সেরে বেরিয়ে এসেছিল। তবু তো সেটা একটা বিবাহই ছিল। সে বিবাহ সুরঞ্জনাকে একটা স্বস্তি দিয়েছিল, আলোকময়কেও এক ধরনের আশ্বাস দিয়েছিল। সেই আত্মীয়বন্ধু-সমাগমহীন বিবাহ যেন তাদের দুজনের পক্ষেই প্রাসঙ্গিক ছিল, আর কেউ খুব একটা বুঝেও উঠতে পারত না যে, বিবাহ দাম্পত্যে পরিণত হলো না, সে বিবাহের প্রয়োজন কী ছিল?

আট

এই এত রকম সময় পেরিয়ে ওরা এখন শেয়ালদা স্টেশনের এই ক্যান্টিনটাতে বসে আছে। ওরা সেই সব কথা বলাবলি করছে যে কথাগুলো ওদের এত দিনের সম্পর্কজুড়ে একটা নিজস্ব অর্থ পেয়েছে। ওরা এমন কোনো নতুন কথা উচ্চারণ করছে না, যাতে ওদের সম্পর্কের মধ্যে নতুন অর্থ সঞ্চারিত হতে পারে। ওরা ওদের সম্পর্কের ভিতর তেমন অর্থ তৈরির সময় পার হয়ে এসেছে। এখন আর নতুন কোনো প্রসঙ্গ, প্রসঙ্গান্তর, বিপত্তি বা সংকট নিয়ে কথা নেই। সুরঞ্জনা এমন কথা বলে, যার উত্তর তার জানা। আলোকময় এমন কথা বলে, যার কোনো উত্তর হয় না। এ যেন সারা দিনের পরিশ্রমের শেষে এক কৃষক দম্পতির সংলাপ—ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে, বাইরের সুপুরি গাছে বাবুই পাখির বাসায় জোনাকির আলো, তাদের দুজনের মধ্যে কর্মবিরত অন্ধকার। এখন তারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের মতো করে কথা বলছে। বা কথা বলে-বলে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করছে।

একদিন থেকে ঐ রেজিস্ট্রেশনই ছিল তাদের সম্পর্কের ইতিহাসের একটা চরমবিন্দু। যদি তারা এটা প্রায় প্রকাশ্য ঘোষণার পর করত, যদি আলোকময় তাদের অফিসের সবচেয়ে নির্ভেজাল, সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যানার্জিদাকে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে না এসে তার মা

https://boierhut.com/fb

বা দাদা বা দিদিকেই সাক্ষী হতে বলত, যদি সেই রেজিস্ট্রেশনের পরই তারা তাদের বিবাহিত জীবন শুরু করে দিত, তা হলে হয়তো এত দিনে তাদের সম্পর্কটা একটা পরিণতির দিকে যেত, যেমন পরিণতি তাদের সম্পর্কের হতে পারে। এটা তো আর সম্ভব নয় যে সুরঞ্জনা ছেলেমেয়ে দুটিকে ভাসিয়ে দিয়ে সেই নতুন বিবাহিত জীবন শুরু করবে। আবার এটাও সম্ভব নয় যে সুরঞ্জনা বিয়ে করেও তার বৈধব্যই পালন করে যাবে।

সেই যে একটা কোনো সমাধানে তা তাদের রেজিস্ট্রেশনের পরও তৈরি হলো না। তাদের সম্পর্কও নতুন কোনো মোড় নিল না। শুধু ব্যবস্থাগত কিছু পরিবর্তন তারা করে রাখল। ভবিষ্যতে সুরঞ্জনা যাতে প্রয়োজনে তার নিজের জীবনকে ছেলেমেয়ের মধ্যে আর আলোকময়ের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারে, সেই জন্য আলোকময় ইছাপুরে ট্রান্সফার নিল, ইছাপুরে একটা কোয়ার্টারও পেল।

নতুনত্বের মধ্যে একদিন শুধু এইটুকু ঘটল যে সুরঞ্জনা সারাদিন সেই কোয়ার্টারে কাটিয়ে এসেছিল। কিন্তু একদিন এ রকম কাটিয়ে এসেই সুরঞ্জনা বুঝেছিল, এমন ভাবে আলোকময়ের কোয়ার্টারে ন-মাসে ছ-মাসে একদিন যাওয়া যায়, দুদিন যাওয়া যায়, নিয়মিত যাওয়া যায় না। আলোকময়ও বুঝেছিল, সুরঞ্জনার এমন আকস্মিক আসায় তার আসা বরাবরের জন্যে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এখন তারা একটা স্থিতাবস্থার অংশ হয়ে গিয়েছে। তাদের পরস্পর সম্পর্কে আচরণ সেই স্থিতাবস্থার অংশ। তাদের পরস্পরের সংলাপ সেই স্থিতাবস্থার অংশ। তারা একটা সম্পর্কের চরম বিন্দু পার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নতুন আরম্ভের কোনো নাটকীয় উদ্যোগ নিচ্ছিল না।

অথচ তারা তো আসলে নতুন আরম্ভের মুখেই আজ দাঁড়িয়েছিল। আলোকময় চিঠি টাইপ করে এনেছে। কাল সেই চিঠি সকালবেলাতেই অফিসে জমা দিয়ে দেবে সুরঞ্জনা। তাতে তো এই ঘোষণা আছে সে, সুরঞ্জনা, নতুন বিবাহিত জীবন শুরু করেছে। সেই চিঠিটা লিখে, টাইপ করে, খামে পুরে, ব্যাগে ভরে নিয়ে এসে আলোকময় সুরঞ্জনার সঙ্গে বসে চা খাচ্ছে, অর্থহীন গল্প করছে আর সেই অর্থহীন গল্প থেকে পুরনো অভ্যাসে কিছু সঞ্চয় করার চেষ্টা করছে। অথচ একবারের জন্যে চিঠিটা বের করে সুরঞ্জনাকে পড়াল না, চিঠিটা ঠিক লেখা হলো কি না তা নিয়ে সুরঞ্জনার সঙ্গে কোনো আলোচনা করল না, দরকার হলে নতুন চিঠি লিখতে হবে কি না সে-বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করল না। যেন তাদের অফিসে রাত-দিনই এ রকম স্বামীর মৃত্যুর পর নিয়োজিত কর্মিনীদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, যেন সুরঞ্জনার অফিসে এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয় বা সুরঞ্জনাকে কোনো অভাবিতপূর্ব অবস্থার সম্মুখীন আগামীকাল হতে হবে না, যেন সুরঞ্জনা জানে এ রকম চিঠি জমা দেয়ার পর কী কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আবার সুরঞ্জনা এতক্ষণের মধ্যে একবারের জন্যেও তো জানতে চায়নি, চিঠিটা টাইপ করে আলোকময় সঙ্গে নিয়ে এসেছে কি না, চিঠিটা একবার দেখতে চায়নি, চিঠিটা পড়ে কোনো পরামর্শ দিতে হতে পারে এ রকম তার মনে হয়নি।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হয়তো এর আগে এ নিয়ে তাদের বিস্তারিত আলোচনা অনেক দিন ধরেই হয়েছে। আবার যেহেতু তারা তাদের সম্পর্কের চরমবিন্দু পার হয়ে এসেছে, তাই, এমন হওয়াও অসম্ভব নয়, এখন তাদের এসব আলোচনা দু-একটি বাক্যেই শেষ হয়ে যায়। হয়তো এর আগে কোনো দিন আলোকময়, বা হয়তো সুরঞ্জনাই বলে থাকবে, চিঠিটা এবার দিয়ে দেয়া দরকার, আর দেরি করা উচিত নয়। চিঠিটা দিয়ে দেয়ার পক্ষে এ রকম একটা সময়ই যে সবচেয়ে উপযুক্ত, তা তো অনেক আগেই স্থির হয়ে আছে। এই বছরই ছেলেমেয়ে কারো কোনো পরীক্ষা থাকবে না। ইস্কাপন ফিজিক্স অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে পড়ছে, গত বছর জয়েন্ট এন্ট্রাস দিয়েছিল, পায়নি, এবার আর-একবার দেবে। পেলে ফিজিক্স ছেড়ে দেবে, না-পেলে ফিজিক্সই পড়বে। তাতার এবার ক্লাস এইট। সামনের বছরই সেকেন্ডারির সিলেবাস ও পড়াশোনা শুরু হয়ে যাবে। এগুলো তো তাদের ওপর নির্ভর করে না—সব আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। বরং এই সময়সূচিতে তাদের বিয়ের ঘোষণাটাই পূর্বনির্ধারিত নয়। এই সময়সূচির মধ্যে একটা ফাঁক বের করে নিয়ে তাদের কাজটুকু সম্পূর্ণ করতে হবে। তাই তাদের পক্ষে এত প্রয়োজনীয় এই ঘোষণাও তাদের ভিতর কোনো উদ্বেগ, কোনো নাটক, কোনো উৎসাহ তৈরি করছে না। এমন নয় যে সুরঞ্জনার প্রতি আলোকময়ের, বা আলোকময়ের প্রতি সুরঞ্জনার গূঢ় প্রবল টান কিছু কমেছে। এমনও নয় যে তাদের জীবন কোনোভাবে পরস্পর নিরপেক্ষ। তারা একটা উপসংহারের পাত্রপাত্রীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, তাই উপক্রমণিকায় ফিরে যেতে পারছিল না।

'আচ্ছা, এই ক্যান্টিনে তো এত কম লোক চা খায়, এদের চলে কী করে, এত বড় ঘর, আলো, টেবিল, চেয়ার! সবাই তো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই চা খেয়ে নেয়।' সুরঞ্জনা বলে।

আঙুল দিয়ে কাগজের যে-গোল্লাটা আলোকময় পাকাচ্ছিল, সে সেটার দিকেই তাকিয়ে থাকে। মনে হতে পারে সুরঞ্জনার প্রশ্নটা সে শোনেনি, বা সে-প্রশ্নের কোনো জবাব সে দেবে না। একটু সময় কেটে গেলে আলোকময় বলে, 'আমি ঠিক জানি না।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলে, 'বোধ হয় এদের লোকরাও কেটলি করে প্ল্যাটফর্মে চা বিক্রি করে।' আলোকময় আবার চুপ করে যায়, তারপর বলে, যেন তার এবারের উত্তরটাই ঠিক উত্তর, 'আমার মনে হয়, এখানে লোকে ভাত খায় বেশি, চাও খায়, বা চপ-কাটলেটও বিক্রি হয়, কিন্তু এগুলো আসলে ভাতের হোটেল।'

'কী করে বুঝলে। লোকে ভাত খেতে শেয়ালদায় আসবে?'

'না। ভাত খেতে আর শেয়ালদায় আসবে কেন? কিন্তু যাতায়াতের জন্যে তো অনেককে দুপুরে বা রাতে খেতেই হয়। তারা খায়। এই তো পাশে বৈঠকখানায় লাইন দিয়ে পাইস হোটেল। পাশে কোলে মার্কেট। সারারাত খোলা থাকে। এগুলো ভাতের হোটেলই হবে।'

'তুমি বুঝলে কিসে, বলো।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

‘টেবিলগুলো দেখছ না, কত উঁচু আর বড়। চায়ের দোকানের টেবিল এত উঁচু আর বড় হয় না। এ টেবিলে চারজন লোক বসে আরাম করে ভাত খেতে পারবে।’

‘টেবিলগুলো অবিশ্যি সত্যি বড়, চেয়ারগুলোও বড় বড়। তাতে কি আর ভাতের হোটেল হতে পারে?’

আলোকময় একটু চুপ করে থাকে। যখন মনে হয় সে এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলবে না, তখনই সে বলে বসে, ‘শেয়ালদার মতো একটা স্টেশনে একটা পুরোপুরি ক্যান্টিনে, মানে যেখানে চাও পাওয়া যাবে, ভাতও পাওয়া যাবে, থাকবে না, এটা কি সম্ভব?’

সুরঞ্জনা কোনো কথা বলে না, তার মুখ দেখে মনে হয় না যে সে এই নিয়ে কিছু ভাবছে। সে আঙুল দিয়ে মাইকাটপ টেবিলের ওপর কিছু লিখছিল। যা লিখছিল তার ওপরই আবার লিখছিল। এ রকম বার কয়েক লিখে সে জিজ্ঞাসা করে, ‘কখন উঠবে?’

‘তাই তো ভাবছিলাম। ঠিক করেছিলাম তোমাকে বাসে তুলে দিতে যদি দেরি হয়, তা হলে আজকে বালিগঞ্জে চলে যাব, কাল সকালে বালিগঞ্জ থেকে অফিসে যাব, বিকেলে আবার আসব। এখন ভাবছি, শেয়ালদাতেই যখন এতক্ষণ কেটে গেল, তোমাকে এখান থেকে বাসে তুলে দিয়ে সাড়ে নটার কৃষ্ণনগর লোক্যালটা ধরি। তাহলে সকালে কোনো ঝামেলা থাকত না। কাল বিকেলে আসব।’

‘তা হলে তাই করো, তোমার লোকটি রাতের খাবার রাখে তো।

নয়

‘তাহলে ওঠো’, সুরঞ্জনা সোজা হয়ে বসে ব্যাগটা টেনে নিয়ে বলে। আলোকময় তার ভঙ্গি একটুও না বদলে বলে, ‘আর-একটু বসা যায়। আর-এক কাপ চা খাওয়া যায়।’ সুরঞ্জনা যেন বেরিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে উঠেছিল। সে বলে, ‘আর-এক কাপ চা খাবে তো এতক্ষণ বলোনি কেন?’ সুরঞ্জনা ঘাড় ঘুরিয়ে কোনো বেয়ারাকে খোঁজে। কাউকে পায় না। আর-একটা টেবিলে একটা লোক আপন মনে কিছু খেয়ে যাচ্ছিল। আলোকময় চিৎকার করে বলে দেয়, ‘দু কাপ চা দেবেন তো?’

আলোকময়ের গলা শুনে বাইরের দরজায় একজন টুপি পরা লোক এসে দাঁড়িয়ে সেখান থেকেই জিজ্ঞাসা করে, ‘কী? পটে দেব?’

আলোকময় গলা তুলেই বলে দেয়, ‘না। এবার কাপেই দিন’ বলার পর সে অকারণে তার ডান হাতটা মাথার ওপর তুলে ঘুরিয়ে নেয় যেন সেটা তার কথা বলার পক্ষে প্রয়োজনীয় ভঙ্গি। সুরঞ্জনা ব্যাগটা আর কোল থেকে তুলে টেবিলের পাশে রাখে না, সে বরং ব্যাগের ওপরই তার দুটো হাত

https://boierhut.com/fb

রেখে সোজা হয়ে বসে একটু দোলে। সুরঞ্জনা চেয়ার ছেড়ে উঠতেই গিয়েছিল, শেষ মুহূর্তে বাধা পেয়ে আর ভঙ্গি বদলাচ্ছে না। আলোকময় জিজ্ঞাসা করে, 'আর-এক কাপ চা খেতে-খেতে কি তোমার দেরি হয়ে যাবে?'

'দেরি আবার কী হবে? বড় জোর শেয়ালদা থেকে বাস পেতে দেরি হবে। এদিক থেকে তো ঐ রুটে একটি মাত্র বাস চলে। সার্ভিসটা ভালো। তবে রাতের বেলা তো সব উল্টে যায়। এখন হয়তো আধঘণ্টা দাঁড়িয়েও বাস পাব না।'

ঠিক অবিকল এ রকম পরিস্থিতি হয়তো ইতিপূর্বে ওদের ঘটেনি। কিন্তু ঘুরতে-ঘুরতে হাঁটতে হাঁটতে, চা খেতে খেতে দেরি তো অনবরতই ঘটে যায়। তার জন্যে সুরঞ্জনার তারাতলায় ফেরার কোনো অসুবিধে হয় না কখনো। এসপ্ল্যানেড থেকে রাত বারটার পরও শেয়ার ট্যাক্সি ওদিকে যায়, রাত সাড়ে দশটা-পৌনে এগারটা পর্যন্ত তো মিনিবাস ডেকে ডেকে প্যাসেঞ্জার জোগাড় করে, রাত বারটা পর্যন্তও দুটো একটা প্রাইভেট বাস চলে। তারাতলায় নেমে পর্ণশ্রীর দিকে খানিকটা গেলে তবে তাদের কোয়ার্টার। সে যত রাতই হোক, অটো পাওয়া যায়। সুরঞ্জনার চোখে-মুখে কোথাও কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। বেয়ারা চা দিয়ে গেলে সে বেশ নিশ্চিন্ত মনে ছোট্ট একটা চুমুক দেয়। আলোকময় কাপটা টেনে নেয় কিন্তু চুমুক না দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, শেয়ালদা থেকে বাস না পেলে সোজা ধর্মতলায় চলে যেও, এখানে বাসের জন্যে দাঁড়ানোর চাইতে আগে পৌঁছে যাবে।'

আলোকময় এইবার চায়ে চুমুক দেয়, 'না, ওদের কাপের চাও ভালো।' সুরঞ্জনা চাটা গিলে বলে, 'তুমি আবার আমাকে ধর্মতলা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে যেও না। তা হলে তোমার সাড়ে নটার ট্রেন মিস করবে।'

'আরে আমার তো সাড়ে নটার কৃষ্ণনগর লোক্যালের পর পৌনে দশটায় নৈহাটি আছে, দশটা পাঁচে কল্যাণী আছে, দশটা বাইশে আবার কৃষ্ণনগর আছে। আমার কি তোমার মতো নাকি?'

'তা হলে তুমি সাড়ে নটার ট্রেনের কথাটাই বললে কেন, তুমি তো দশটার ট্রেনের কথাও বলতে পারতে।

'ওগুলো হচ্ছে ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের মুদ্রাদোষ। মনে মনে একটার পর একটা ট্রেন ধরবে আর ক্যানসেল করবে। আমার সাড়ে নটার ট্রেনে যেতেই হবে কে দিব্যি দিয়েছে। তা ছাড়া তুমি যদি শেয়ালদা থেকে বাস পেয়ে যাও তা হলে আমি সাড়ে নটারটাই ধরতে পারব।'

সুরঞ্জনা একটু হেসে বলে, 'তা হলে আমি শেয়ালদা থেকে প্রথম যে-বাসটা পাব সেটাই ধরব, তারাতলা হলে তারাতলা, ধর্মতলা হলে ধর্মতলা। তুমিও তোমার সাড়ে ৯টা ধরবে।'

'বাবা! তুমি দেখছি ট্রেন ধরা আর বাস ধরা ছাড়া কোনো কথা বলবে না।'

'না, আমার তো কোনো টেনশন নেই, আমি তো রাত বারটার পরেও ধর্মতলা থেকে সোজা পৌঁছে যাব। তোমাকে নিয়েই তো চিন্তা, ট্রেন পাবে কি না, না-পেলে কী করবে?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'আমার ট্রেনও তো ঐ রাত বারটা পর্যন্ত। তাছাড়া আমার তো বালিগঞ্জে একটা বাড়ি আছে, নাকি?'

'বললে যে সকালে ঘুম থেকে উঠে ইছাপুর যাওয়াটা একটা হাঙ্গামা।'

'হাঙ্গামা আর কী। অ্যালার্ম দিয়ে শুতে হবে। বা মাকে বলে দিতে হবে ডেকে দিতে। ছটার সময় বাসট্রামের ভিড় দেখলে অবাক হয়ে যাবে। এখানকার ফ্যাক্টরির লোকও আছে, শেয়ালদা আর হাওড়া লাইনের ডেইলি প্যাসেঞ্জারই বেশি। অতটা না হলেও প্রায় সকাল নটার মতোই ভিড়। তোমার এইটি এক মস্ত আরাম, ট্রাম বাস ঠেঙিয়ে অফিস করতে হয় না, হেঁটে-হেঁটেই অফিস যেতে পার।'

'হ্যাঁ। ঐটুকু আরাম আছে। কিন্তু তা থেকে বদভ্যাসও হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে যদি বাস-ট্রাম-ট্রেন টেঙাতে হয়, তা হলে ভয় লাগবে, পারব না।'

'সেই সম্ভাব্য ভবিষ্যতের কথা ভেবে আলোকময় বলে, 'সে দেখবে তখন তোমার রুটিন এমন হয়ে গেছে যে গায়ে লাগছে না। আমার তো মনে হয় কলকাতায় যখন ছিলাম তখন চাকরি করতে যে-অসুবিধা হতো, এখন ইছাপুরে তার চাইতে অনেক কম অসুবিধে।' আলোকময়ের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে কাপটা সরিয়ে দিয়ে বলে, 'তোমার হয়েছে?' সুরঞ্জনার কাপে কিছুটা চা ছিল। এদের কাপগুলো বেশ বড়-বড়। সুরঞ্জনার আর খেতে ইচ্ছে করল না। সে কাপটা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ হয়েছে, উঠবে তো?'

'হ্যাঁ, চলো, উঠি', আলোকময় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, সুরঞ্জনাও। ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে পাশের চেয়ারটা ওদের আওয়াজ তুলে সরাতে হয়।

এত বড় ঘরটা ফাঁকা, শুধু ওরা দুইজন, পয়সা নেয়ার জন্যেও কোনো কাউন্টার নেই। সুরঞ্জনা হেসে বলে, 'এরা আমাদের বিনে পয়সায় চা খাওয়াল নাকি?' বলতেই যে জায়গাটা চা ইত্যাদি তৈরি করার জন্যে আলাদা করে রাখা সেখানে একটি লোক এসে দাঁড়িয়ে একটা ক্যাশমেমোর মতো বইতে খসখস করে কিছু লিখে, কাগজটা ছিঁড়ে এগিয়ে দেয়। সেটা নেয় সুরঞ্জনা, 'ষোল টাকা দশ পয়সা', আলোকময় পকেট থেকে একটা কুড়ি টাকার নোট বের করে দেয়। লোকটি বলে, 'এক টাকা দিন।' আলোকময় নিজের পকেটে একটা টাকা খোঁজে, পায় না, দশ পয়সার একটা মুদ্রা রেখে বলল, 'এক টাকা নেই' 'দাঁড়াও, দেখি', সুরঞ্জনা নিজের ব্যাগ খুলল ও একটা খুব ময়লা, প্রায় ছেঁড়া এক টাকার নোট বের করে রাখল। কাউন্টারের ভদ্রলোক পাঁচ টাকার একটা নোট এগিয়ে ধরেন। সুরঞ্জনা নিয়ে আলোকময়কে দেয়। তারপর ঘর থেকে বেরোতে-বেরোতে সুরঞ্জনা বলে, 'তোমাকেই আমার চা খাওয়ানো উচিত ছিল, তুমি তো প্ল্যাটফর্মের চা খেতে চাইছিলে।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বাইরের বারান্দাটা ফাঁকা, সিঁড়িটা ফাঁকা। এমনকি স্টেশনের লবিতেও যেন তেমন ভিড় নেই। এখন এখানে ভিড় থাকবে না। যে যে ট্রেন ধরতে চায়, সে সেই ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে গিয়ে ভিড় করে আছে। আর ওদিক থেকে প্যাসেঞ্জার আসার বড় ভিড় এখন আর হবে না, সে সময় পেরিয়ে গেছে। স্টেশনের লবিটা পার হয়ে সিঁড়িতে পা দেয়ার আগেই পিছন থেকে একটা ট্রেনের উদ্‌গীরিত ভিড় তাদের ঘিরে ফেলে, তারপর তাদের টপকে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। এই সব ভিড় যে রকম বেগে ধেয়ে যায় তাতে সুরঞ্জনার আর আলোকময় পরস্পরের কাছ থেকে ছাড়াছাড়িও হয়ে যেতে পারে। সুরঞ্জনা আলোকের আঙুল চেপে ধরে, তারপর একটু দাঁড়ায়, তারপর একটু ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে, ভিড়টা যাতে তাদের পার হয়ে চলে যেতে পারে।

শেয়ালদা স্টেশনের চত্বরটা এত বড় যে অত বড় ভিড়টা ঐ চত্বরে পড়ামাত্র কেমন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন আর ভিড়ের সেই বেগ থাকে না। চত্বরের মাঝখানে একটা স্তম্ভের মাথা থেকে যে আলো সারা চত্বরে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সেটাতে আবছা বেগনি মেশানো। মানুষের জামাকাপড় আর মুখের ওপর সেই আবছা বেগনি আলোটা পিছলে যায়। ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে এক গতিতে বাস চলে যায় বিপরীত দিক আর ট্রামের সরলরেখা কেমন মাঝখানে ভেঙে যায়।

আলোকময় আর সুরঞ্জনা বাঁ দিকে ঘোরে, তারপর কোনাকুনি হেঁটে শেয়ালদা কোর্টের নতুন বাড়ির দিকে যায়। ওদিক দিয়ে বাইরে বেরোবার একটা গেট আছে, ওরা সেই গেট দিয়ে বেরিয়ে এনআরএসের সামনে পড়ে। সেখানে সব বাসই এসে দাঁড়ায়। ওখান থেকেই বাস ধরবে সুরঞ্জনা, তারাতলার, না পেলে ধর্মতলার।

দশ

ওদের হাঁটা দেখে বোঝা যায় না ওরা এতক্ষণ অলসভাবে বসে বসে চা খাচ্ছিল আর অকারণ কথা বলছিল, চুপ করেও থাকছিল। মনে হচ্ছে, ওরা যেন এভাবেই হেঁটে আসছে বেশ কিছু দূরত্ব, যেন ওদের হাঁটার একটা উদ্দেশ্য আছে। ওরা স্টেশন চত্বরের চাপা বেগনি রঙের সীমা পার হয়ে যাচ্ছিল। এমনি তাকালে বোঝা যায় না কিন্তু কেউ গেলে পিছন থেকে বোঝা যায় সে উজ্জ্বলতর আলোর পরিধি ছাড়িয়ে একটা আবছায়া জায়গা দিয়ে যাচ্ছে। স্টেশন চত্বরের ভিড়টা আলগা ছিল, যে যার মতো করে চত্বরটা পার হয়ে যাচ্ছে, গা ঘেঁষাঘেঁষি ঠেলাঠেলি ভিড় ছিল না। এখন, যখনই ওরা ফ্লাইওভারের তলা দিয়ে বা পাশ দিয়ে, বেলেঘাটা মেইন রোডের শুরুটা পেরোয় তখনই ভিড়ের মধ্যে পড়ে যায়। ফ্লাইওভার দিয়ে সাঁ সাঁ আওয়াজ তুলে উত্তর থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ থেকে উত্তরে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে বেলেঘাটা মেইন রোডে গাড়ির সারি দাঁড়িয়ে পড়ে।

https://boierhut.com/fb

ফ্লাইওভার থেকে বেলেঘাটার দিকে গাড়িগুলো দ্রুত বাঁক নিচ্ছিল। যে গাড়িগুলো বেলেঘাটা মেইন রোডের মুখে বাঁ-দিকে ঘোরার জন্যে দাঁড়িয়েছিল সেগুলো একটা ফাঁক খুঁজছিল, কিন্তু গাড়িগুলো প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে সার্কুলার রোড পেরোচ্ছিল। গাড়িগুলো বিভিন্ন সাইজের ও বিভিন্ন রঙের বলে এই গাড়ির প্রবাহকে একটা বহতা দেয়াল মনে হচ্ছিল না। নইলে এই গাড়িগুলো দেয়ালের মতোই একটা বাধা হয়ে ওপারের দৃশ্যকে আড়াল করছিল। ফ্লাইওভারের মাঝখানটার সবচেয়ে উঁচু জায়গায় আলো যেন ফেটে পড়ছে। এই একটা উঁচু জায়গা থেকে ফ্লাইওভারের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে বা ফ্লাইওভারের মধ্যবিন্দু থেকে তার তিনদিকের আলোকিত ঢালে গাড়ির গতির তীব্রতা ও খর বাঁক দেখা যাচ্ছে। সুরঞ্জনা আর আলোকময় পাশাপাশি একটু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যাতে তাদের মধ্যে আর কেউ ঢুকে যেতে না পারে আর রাস্তাটা খোলা পেলেই যাতে তারা পেরিয়ে যেতে পারে।

যে শৃঙ্খলার সঙ্গে গাড়িগুলো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, ট্রাফিকের জন্যে আটকানো মানুষ সেই শৃঙ্খলার সঙ্গে রাস্তা পার হচ্ছিল না। সেই ভিড়ের রাস্তা পার হওয়ার মধ্যে যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা থাকে, কে কার আগে রাস্তা পার হতে পারবে, অথচ যেন একটা ভয়ও কাজ করে, রাস্তাটা আবার বন্ধ হয়ে যাবে। কেউ কেউ দৌড়ে পার হয়, কেউ কেউ হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে আবার নিজের হাঁটার ছন্দে ফিরে আসে। সুরঞ্জনা যে আলোকময়ের আঙুলগুলো চেপে ধরেছিল, সে রাস্তা পার হওয়া পর্যন্ত নিজের হাত আর আলোকময়ের হাত থেকে খোলে না। রাস্তা পার হয়ে তাদের আবার সিঁড়ি দিয়ে ফ্লাইওভারের পাশের গলিটুকুর ভিতর নামতে হয়। সুরঞ্জনা এই সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আলোকময়ের হাত ছেড়ে দেয়। সুরঞ্জনা আগে আগে নামে, পিছনে পিছনে আলোকময়। ঐ গলিপথটুকু পার হয়েই সবাই আবার খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে। বাসগুলো থামে এনআরএস হসপিটালের গেটের সামনে। কোনবাস কোথায় দাঁড়াবে ঠিক নেই।

মিনিবাসগুলো এসে রাস্তার পাশের কোনাকুনি দাঁড়ায়, পেছনের বাস যাতে জায়গা না পায়। পিছনের বাসগুলো আরো ডানদিকে সরে বাঁয়ে বাঁক নিতে যায়। দক্ষিণ থেকে উত্তরে যে গাড়িগুলো আসছে, তার মুখোমুখি পড়ে যায়। ফলে সেখানে একটা ট্রাফিক জ্যাম তৈরি জয়। কোনো বাসই কোনো দিকে এগোতে পারে না। ইতিমধ্যে সে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মিনিবাস কিছু যাত্রী তুলে হুস করে মৌলালির দিকে এগিয়ে যায়। বাঁ-দিকটা এবার খোলা পেয়ে বাসগুলো বাঁয়ে বাঁক নেয়। কোনো কোনো বাস দাঁড়ায় ফ্লাইওভারের ঠিক তলায়। সেখান থেকে ঠুকরে ঠুকরে যাত্রী তুলতে তুলতে আস্তে আস্তে এগোতে থাকে মৌলালির দিকে। সামনের বাসটাও যদি ধীরে ধীরে চলে তা হলে ফ্লাইওভার দিয়ে নামা পিছনের বাসগুলো গতি বাড়িয়ে এই বাসগুলোরও সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। যেসব যাত্রী বাস চিনতে পারে তারা ফ্লাইওভারের তলা থেকে দৌড়তে থাকে বাসের দিকে। কারো কারো কাছে মালপত্রও থাকে। তারা পোঁটলা বা চটের বড় থলি বা বড় ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বাসের

https://boierhut.com/fb

দিকে ছোটে। ফ্লাইওভার স্টপ, বা এনআরএস, বা শেয়ালদা স্টপ, বা প্রাচী স্টপে এটাই প্রধান সমস্যা—নিজের বাসটি খুঁজে বের করে, ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে, বাসটির ভিতর উঠে পড়া। বাস দেখেও শেষে হয়তো অনেকের বাসে ওঠা হয় না, তখন পরের বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। এখন রাতের ঠিক সেই সময় যখন মিনিবাস আর প্রাইভেট বাসগুলো দিনের শেষ খেপ তুলে নিচ্ছে, সরকারি বাস কমে আসছে, অটোরিকশা রুট বদলাচ্ছে।

সুরঞ্জনা গলা উঁচু করে বাস দেখছিল—যাতে ফ্লাইওভারের ওপর বাসটা চিনতে পেরে তার গতি দেখেই সে আন্দাজ করে নিতে পারে বাসটা কোথায় দাঁড়াবে, ফ্লাইওভারের তলায়, এনআরএসের গেটে, নাকি আরো খানিকটা এগিয়ে, নাকি আরো খানিকটা এগিয়ে প্রায় মৌলালিতেই। অনেক বাসই একটু এগিয়ে গিয়ে থামে, তারপর মৌলালিতে আর দাঁড়ায় না। সুরঞ্জনা গলাটা বাড়িয়ে আলোকময়কে বলে, 'তুমি বাস দেখতে পেলেই বলো, তারাতলাই হোক আর ধর্মতলাই হোক।' আলোকময়ও বাস দেখতে থাকে। তারা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে বাসের নম্বর পড়া মুশকিল। হয়তো একটা সংখ্যা পড়া যায়, বাকি সংখ্যাগুলো পড়া যায় না। আর বাসের নম্বরও তো বিচিত্র। কোনো কোনো নম্বর শুধুই সংখ্যার। সে সংখ্যার মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতা নেই। দুশর ওপরের সংখ্যা যেমন আসছে, তেমনি একশর নিচের সংখ্যাও আসছে। একশর নিচের সংখ্যায় আবার এবিসি এই সব অক্ষর লাগানো। এক যারা সব নম্বর দেখতে অভ্যস্ত তারা চট করে বাসটা বের করতে পারে। আলোকময় বাসগুলোর দিকে তাকিয়েছিল, সে তারাতলার বাসই খুঁজছিল, কিন্তু প্রায় কোনো বাসেরই পুরো নম্বর পড়তে পারছিল না। আঙুল তুলে সুরঞ্জনাকে বলছিল, 'দেখো তো, দেখো তো, ঐটা কি না?'

'না না, চলো তো একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াই, এগুলো তো অন্য রুটের বাস', সুরঞ্জনা এগিয়ে যায়। আলোকময় তার পিছন পিছন যেতে যেতে বলে, 'তুমি তো প্ল্যানেটোরিয়ামেও নামতে পারো, সার্কুলার রোডের বাসও তো নিতে পারো।'

'না, ওটা বাজে জায়গা, বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায় না আর বাসগুলোও এখন ও ওখানে দাঁড়ায় না, সোজা চলে যায়', সুরঞ্জনা দু-একবার ঘাড় ঘুরিয়ে গলা উঁচু করে কথা বলে, গলা না তুললে আলোকময় শুনতে পাবে না।

'এগিয়ে দাঁড়ালে কী লাভ হবে?' আলোকময় জিজ্ঞাসা করে।

'না। এখান থেকে প্যাসেঞ্জার ফেলে যাবে না, ওখানে দাঁড়ানোর কোনো মানে হয় না, কিছু বোঝাই যাচ্ছে না।'

সুরঞ্জনা একটা জায়গায় এসে দাঁড়ায়। সে ডাইনে তাকিয়ে, বাঁয়ে তাকিয়ে, নিজের পিছনে তাকিয়ে, সামনে তাকিয়ে, দাঁড়ানোর জায়গার অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ যেন নির্ধারণ করে। তারপর বলে, 'এখানে দাঁড়িয়ে দেখো, কোনো-না-কোনো বাস পাওয়া যাবেই।' ঐ জায়গাটিতে ভিড় ছিল। ভিড়ের

https://boierhut.com/fb

এক-একটা অংশ এক-একটা বাস আসার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল, আবার নতুন লোক এসে ভিড় বাড়াচ্ছিল। অনেককে একটা বাসের সামনে দিয়ে বা পিছন দিয়ে গিয়ে রাস্তার মাঝখানে আর-একটা বাসে উঠতে হচ্ছিল। সুরঞ্জনা বাসে ওঠার প্রস্তুতিতে শাড়ির কুঁচি উঁচু করে ধরেছিল যাতে বাস এলেই সে টুপ করে উঠে পড়তে পারে। বাসের নম্বর দেখার জন্য তার সারাটা শরীরই টানটান, গলাটা বাড়ানো, শরীরটাও বাড়িয়ে দেয়া, হাঁটুতে টান লাগছে, 'এখানেই পেয়ে যাবে বাস, দেখো', সে অকারণে আলোকময়কে আশ্বস্ত করে।

আলোকময় ঠিক এই সময়টাই বেছে নেয় তার ব্যাগের ভিতর থেকে চিঠিটা বের করতে। 'এটা তোমার ব্যাগে ভরে রাখো, কাল সকালেই জমা দিয়ে দিয়ো, আমি কাল বিকেলে তোমাকে অফিসে ফোন করব।'

'কাল যদি এই চিঠির কথা ইস্কাপনকে বলি তা হলে তো আর বেরোতে পারব না। তুমি বরং পরশু ফোন করো।'

'তুমি চিঠি দিয়ে দিয়েছ জানলে আমিও কাল বাড়িতে জানাব। কাল ঐটুকুই জানব, চিঠি জমা পড়ল কি না?'

বাসের আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে সুরঞ্জনা ডান হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নেয়, তারপর চিঠিটা ব্যাগে ঢোকাতে তাকে মাথা নিচু করতে হয়, 'সব ঠিক লিখেছ তো?'

'হ্যাঁ, আমি দু বছর আগে বিয়ে করেছি, সুতরাং আমার বিধবা পেনশন বন্ধ করে দেবেন। ম্যারেজ সার্টিফিকেটের জেরক্স দিয়ে দিয়েছি। দু বছরের টাকা কিস্তিতে শোধ করে দেব লিখেছি।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এগার

সুরঞ্জনার অফিসে আসার সময় সকাল আটটা বাজতে পাঁচে। তাদের অফিস বসে সকাল আটটা থেকে, সুরঞ্জনা বরাবরই পাঁচ মিনিট আগে আসে। সে যে পাঁচ মিনিট আগেই আসতে চায়, তা নয়। সকালে তার ঘুম ভাঙার পর নিজের জন্য কিছু খাবার বানিয়ে খেয়ে, দুপুরে খাওয়ার জন্যে রুটি তরকারি নিয়ে, ছেলেমেয়েদের সকালের খাবার টেবিলে রেখে তারপর সে অফিসে রওনা হয়। স্নানও সে সকালেই সারে। সুরঞ্জনার একটু ঠাণ্ডা লাগার ধাত আছে, সেজন্যে গরমের মাসতিনেক বাদ দিয়ে সারা বছরই এক কেটলি গরম জল করে নেয়, স্নানের জলের সঙ্গে সেই গরম জল মেশালে জলের ঠাণ্ডা ভাবটা কেটে যায়। এমনকি বর্ষার সময়ও যদি সরাসরি কলের জলে স্নান করে সুরঞ্জনা তা হলে স্নানের পর পরই তার মাথাটা ধরে যায়। এই মাথাধরা নিয়ে সে ওষুধ-বিষুধ কম খায়নি। তাদের অফিসের একজনের হোমিওপ্যাথিতে খুব নামডাক। তার ওষুধও অন্তত টানা ছ-মাস খেয়েছে। এখন এটা অভ্যেসেই দাঁড়িয়ে গেছে, এই গরম জল মিশিয়ে সকালে স্নান করা। সুরঞ্জনা যে ঘড়ি দেখে তাড়াহুড়ো করে তৈরি হয়, তা নয়। সে প্রতিদিনের মতো জাগে ও তার কাজগুলো পর পর করে যায়। যখন সে বাড়ির সদর দরজা ঠেলে বেরোয়, তখন সিঁড়িতে ঘটিটা দেখে, রোজই পৌনে আটটা। তার কোয়ার্টার থেকে অফিসে আসতে দশ মিনিট হাঁটতে হয়। সুরঞ্জনা কোনো কারণে অফিসে আসে দেরি করে না, বা, এক-একদিন এক এক সময়ে আসে না। পাঁচ-দশ মিনিটের হেরফেরও হয় না তার—এমনই অভ্যেস সে তৈরি করেছে। অথচ অফিসে তাকে কাজ করতে হবে, এ-কথা তো আর কখনো ভাবেনি। তবে স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে যে বয়সে চাকরিতে ঢুকতে হয়েছে, তাতে বলা চলে সে প্রথম থেকেই চাকরি করছে। নতুন অভ্যেস তৈরি করতে আর কদিন লাগে। একুশ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। তখন তো একবার পুরো জীবনযাপনটাই পাল্টাতে হয়েছিল। সাতাশ বছরে সে বিধবা হয় ও চাকরিতে ঢোকে, তখন তাকে আর-একবার জীবনযাপনটা পুরো পাল্টাতে হয়েছিল। সেই পরবর্তী অভ্যাস গত চৌদ্দ বছরে তার জীবনকে এতটাই নিয়মিত করে ফেলেছে যে তারও আগের কথা তার আর স্মৃতিতেও নেই। আলোকময়ের সঙ্গে তার ঘর করা জীবন শুরু হলে, তাকে অভ্যেস আর-একবার বদলাতে হবে। তবে সুরঞ্জনার কেন যেন মনে হয়, সে-বদল, আগের দুবারের বদলের মতো আমূল হবে না। তার একটা কারণ, ইস্কাপন আর তাতা। অভ্যেসের যে-বদলই ঘটুক না কেন সুরঞ্জনার, সেসব কিছুই তো ঘটবে ইস্কাপন আর তাতাকে অপরিবর্তিত রেখে। যদি এমন হতো, আলোকময় এই কোয়ার্টারেই থাকছে, তা হলে বদল ঘটত সবচেয়ে কম। যদি এমন হয়, সে একদিকে তারাতলা, আর-একদিকে ইছাপুর সামলাচ্ছে, তা হলেও যেটুকু বদল ঘটবে তা সে সামলাতে পারবে। যদি আলোকময়ের বালিগঞ্জের বাড়িতে তাকে ছেলেমেয়ে নিয়ে গিয়ে উঠতে হতো, তা হলে অবিশ্যি

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বিপদ হতো সবচেয়ে বেশি—সেখান থেকে তারাতলায় অফিস করা, তা ছাড়া আলোকময়ের মা আছেন, দাদা আছে, বৌদি আছেন।

পরদিন অর্থাৎ শেয়ালদায় আলোকময় বাসস্ট্যান্ডে তার হাতে চিঠিটা দেয়ার ও সেটা তাড়াহুড়ো করে ব্যাগে ঢোকানোর পরদিন, আটটা বাজতে, পাঁচে অফিসে এসে সুরঞ্জনা দেখে, প্রতিদিনের মতোই সুলভবাবু বসে আছেন। উনি আসেন সুরঞ্জনারও পাঁচ মিনিট আগে। ওঁকে লোকাল ট্রেনে ঘণ্টা দুয়েক আসতে হয়। অফিস-টাইমের ভিড় এড়াতে উনি বরাবরই একটু সকালে আসেন। এখানে একটা হোটেলের সঙ্গে ওঁর ভাতের বন্দোবস্ত আছে, সেখান থেকে নির্ধারিত লোক দুপুর বেলায় টিফিন ক্যারিয়ারে ভাত দিয়ে যায়। এ রকম অনেকেরই বন্দোবস্ত আছে। যাঁরা কলকাতার ভিতর থেকেই যাতায়াত করেন তাঁদের বাড়ি থেকে টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে আসার বাঁধা লোক আছে। সুরঞ্জনার মতো যারা কোয়ার্টারে থাকে, তারা টিফিনের সময় কোয়ার্টারে গিয়ে ভাত খেয়ে আসে। কতটুকু আর সময় লাগে—যেতে-আসতে, খেতে? সুরঞ্জনাও তাই করত, অনেকদিন তাই করে আসছিল। বছরের পর বছর এ রকমই হয়ে আসছিল। বছর চার-পাঁচ আগে সুরঞ্জনা বুঝতে পারে, তার শরীর হঠাৎ ভারী হয়ে উঠছে, হাঁটার গতিও একটু কমে আসছে, আগেকার মতো তড়বড়িয়ে কাজ করতে একটু-একটু হাঁফও ধরছে। তখন থেকেই সুরঞ্জনা সাবধান হয়। তাকে বাড়ির কাজ বিশেষ করতে হয় না। সে বাড়ি থেকে বেরোবার পরপরই রান্নার ঠিকে লোক আসে। সে দু বেলার রান্না করে, ওবেলার রান্না ফ্রিজে তুলে ছেলেমেয়েদের খাইয়ে স্কুলে-কলেজে পাঠিয়ে ঘরদোর বন্ধ করে বেলা দুটো-আড়াইটে নাগাদ নিজে খেয়ে একটু গড়িয়ে নেয়। বাসন মাজা, ঘরমোছা আর কাপড় কাচার জন্যে আলাদা ঠিকে লোক আছে। সব লোকই পুরনো, বিশ্বাসী। সেসব দিক দিয়ে কোনো অসুবিধে নেই। ইস্কাপন কলেজ থেকে না-ফেরা পর্যন্ত রান্নার লোক বাড়িতেই থাকে। সুরঞ্জনা কোনো-কোনো দিন অফিস থেকেই আলোকময়ের সঙ্গে দেখা করতে বেরোয়, কোনো কোনো দিন বাড়িতে গিয়ে একটু জিরিয়ে বেরোয়। কিন্তু তার যা চাকরি, তাতে পরিশ্রম বলতে তো এক আলোকময়ের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া, কোথাও বসা বা কোনো রাস্তা দিয়ে হাঁটা, তারপর ফিরে আসা। তা ছাড়া সারাদিন তো চেয়ারে বসে-বসে কাজ, একটুও নড়াচড়া নেই, কোনো পরিশ্রম নেই। চেয়ারে বসে থাকতে-থাকতে তো অনেক সময় হাইয়ের পর হাই ওঠে, ঘুম পেয়ে যায়। তখন চা খেয়ে ঘুম তাড়াতে হয়, অথবা জোর করে চেয়ার ছেড়ে উঠে একটু হেঁটে আসতে হয়। শরীর শরীরের নিয়মেই এই অপরিশ্রমের বদলা নেয়। সুরঞ্জনা বুঝতে পারে তার একটু-আধটু মেদ জমছে। অন্য উপসর্গও একটু-আধটু দেখা যায়। তখন থেকেই সেই চার-পাঁচ বছর আগে থেকেই সে দুপুরে রুটি খাওয়া শুরু করে। নিজেই সকালে চারটে রুটি আর একটু তরকারি বানিয়ে নেয়। দুপুর বেলাও সে রুটির গা থেকে আটার ধুলো ঝরে। তরকারি থেকে আলুটা বাদ দিতে পারলে ভালো হতো। বেগুন ভাজাটা এমন ঠাণ্ডা হয়ে নেতিয়ে যায় যে খাওয়ার সব স্বাদ চলে

https://boierhut.com/fb

যায়। তাই আলুটা আর বাদ দিতে পারেনি সুরঞ্জনা। আলোকময় একটা টিফিন বাক্স কিনে দিয়েছে, তাতে রুটি আর তরকারি দুপুর পর্যন্ত প্রায় গরমই থাকে। এতে সুরঞ্জনার শরীর কিছু হাল্কা হয়েছে কি না সে বোঝে না, তবে তার খাওয়ার অভ্যেসটা বদলে গেল।

সুরঞ্জনার হাতে সেই যে চিঠিটা তুলে দিয়েছিল আলোকময়, তারপর সুরঞ্জনা একবারও চিঠিটা দেখেনি। বাসের ভিতর পয়সার ব্যাগটা বের করার সময় লম্বা খামটা খচখচ করেছিল। বাড়িতে ফিরে ব্যাগটা ব্যাগের জায়গায় রেখে দিয়েছে, আজ আবার টিফিন বাক্সটা ঢোকানোর সময় সেটা হাতে ঠেকে। রাতে শুতে যাওয়ার আগে একবার চিঠিটা বের করে দেখবে ভেবেছিল, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর ইস্কাপন আর তাতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চিঠিটার কথা ভুলেই গিয়েছিল।

এখন এই আটটা বাজতে পাঁচে সুরঞ্জনার যেন তার দৈনন্দিন কাজে ঢুকে পড়ে। সেই সুলভবাবু বসে আছেন। ঘরটা একটু আগে ঝাড় দেয়া হয়েছে, টেবিলগুলোও মোছা হয়েছে, অন্তত ঝাড়ন একবার বোলানো হয়েছে, বেশ পরিচ্ছন্ন লাগে সকালের এই কিছুটা সময়। কিন্তু এই সময়ে মিনিটে মিনিটে ঘরের চেহারা পাল্টাতে থাকে। প্রায় প্রত্যেকেরই আসার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। আটটা পনেরোর মধ্যে সবাইকে সই করতে হবে। নইলে লাল দাগ পড়ার কথা। কিন্তু সেকশন অফিসারের অফিস শুরু হয় বেলা দশটা থেকে। তাই বড়বাবু তিনি আসার আগে লাল দাগটাগ দিয়ে খাতা তৈরি করে ফেলেন। সে কথা সবাই-ই জানে, কিন্তু সেজন্যে প্রায় কেউই বেলা দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে না। এ সেকশনে এক সুপ্রকাশ আছে যার আসার কোনো সময় ঠিক নেই। তাকে কিছু বলার উপায় নেই কারণ সেকশনের যত কঠিন ঝামেলা সে সামলায়। তা ছাড়া আর সবাই-ই আটটা-সাড়ে আটটার মধ্যে চলে আসে। এই এত বড় হল ঘরটা মিনিটে মিনিটে ভরে গিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে একেবারে ভর্তি হয়ে যায়।

টেবিলে বসেই যে সুরঞ্জনার চিঠিটার কথা মনে পড়ে, তা নয়। রোজকার অভ্যেসে সে চেয়ারে বসে প্রথমে ড্রয়ারের তালা খোলে, তারপর ড্রয়ারের ভিতর থেকে কাচের গ্লাসটা বের করে সামনে ঢাকা দিয়ে রাখে, একটু পরেই এসে জল দিয়ে যাবে। তার তলার ড্রয়ারটা খুলে কাপটা বের করে গ্লাসের পাশে রাখে। এইবার সে গত কয়েকদিন ধরে যে ফাইলটার ওপর কাজ করছে, সেই ফাইলটা টেনে নেয়। লাইফ ইনসিওরেন্সের স্যালারি সেভিংসে স্কিমে প্রত্যেকের মাসিক যে টাকা কাটার কথা তা কার কোন মাস পর্যন্ত কাটা হয়েছে তার হিসেব বের করতে হবে। লাইফ ইনসিওরেন্স থেকে স্পেশাল টিম এসেছিল, জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে মিটিং হয়, তাতে দেখা যায়, তাদের অফিসের এই স্কিমটা অত্যন্ত অনিয়মিত, অবস্থা এমন যে কোনো কর্মচারীর মৃত্যু হলে সে টাকা পাবে না। কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে তিন ইউনিয়ন থেকেও অফিসের ওপর চাপ দেয়া হয়। ফলে প্রত্যেক সেকশনে অত্যন্ত জরুরি কাজ হিসেবে ফাইলটা ধরা হয়েছে। এই সেকশনে সুরঞ্জনা আর রক্ষিতবাবুর ওপর দায়িত্ব পড়েছে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ফাইলটা খোলেও সুরঞ্জনা। তারপর ওপরের কাগজটির প্রথম শব্দ পড়তেই তার মনে পড়ে যায় কাল সন্ধে থেকে ব্যাগের ভিতরে চিঠিটি আছে। সে ব্যাগটা টেনে নিয়ে খোলে, ভিতর থেকে খামটা বের করে, একটু কুঁচকে গেছে। ব্যাগটা সামনে রেখেই সে ফাইলের ওপর চিঠিটা রেখে হাত দিয়ে সমান করে।

বার

তার ব্যাগটা এত বড় বলেই বোধ হয় ভিতরটা একটা খোঁদল হয়ে যায়, কাগজপত্র কিছু রাখলে তা খানিকটা কুঁচকে যাবেই। আবার খোঁদল বলেই কিছু হারায় না, একটু ফাঁক করে ভিতরে ফেলে দিতে পারলেই হলো। কাল সন্ধেবেলায় বাসস্ট্যান্ডে, সে ভাবেই খামটা ব্যাগের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। আলোকময় তাকে একেবারে বাসস্ট্যান্ডে বাসে ওঠার ঠিক আগে চিঠিটা দিল, তখন ওভাবে রাখা ছাড়া উপায় কী? তাও ভাগ্যিস বাসে ওঠার পর জানলা বা দরজা দিয়ে বাড়িয়ে দেয়নি। আলোকময় কি ভুলে গিয়েছিল, চিঠিটার কথা? কেউ শুধু এই চিঠিটার জন্যেই ইছাপুর থেকে শেয়ালদা এসে চিঠিটার কথা ভুলে যেতে পারে? শুধু চিঠিটার জন্যেই তাদের আজ দেখা করার কথা—তা হলে কি চিঠিটা ভোলা যায়? না, আলোকময় ভোলেনি। তবে ক্যান্টিন থেকে বেরোবার সময় ভুলে থাকতে পারে বা তখন হয়তো ভেবেছে, এখানে আর দিয়ে কী হবে, বরং বাইরে শেয়ালদার লবিতে বা চত্বরে যখন তারা দুজন আলাদা হবে তখন দেবে। আর শেয়ালদার লবিতে বা চত্বরে নেমে ভুলে গিয়ে থাকতে পারে, যা তখন এই দেই, এই দেই করে দেরি করে ফেলেছে। শেষে আচমকা বাসস্ট্যান্ডে এসে বাস দেখতে দেখতে যখন দেখেছে চিঠিটা আর দেয়াই হচ্ছে না তখন তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে চিঠিটা দিয়েছে। আলোকময় যখন দিয়েছে, তার পরে আর দেয়া যেত না, সুরঞ্জনার বাস এসে যেত, সুরঞ্জনা বাস ধরে উঠে পড়ত, বাস ছেড়ে দিত। তা হলে হয়তো আলোকময়ও শেষ মুহূর্তে বাসে উঠে পড়ত। সে তো ধর্মতলার বাস পেলে ধর্মতলা পর্যন্ত এগিয়ে দেবে এ রকম একটা কথাই থাকে। তা হলে ধর্মতলার ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে বা বাসস্ট্যান্ডে সে চিঠিটা

https://boierhut.com/fb

দিত। কিন্তু সুরঞ্জনা তো কাল সরাসরি তারাতলার বাস পেয়ে গিয়েছিল। চিঠি পূর্বমুহূর্তে দেয়া না হলে আলোকময় তারাতলার বাসেই উঠত? তারপর বাসের মধ্যে তাকে চিঠিটা দিয়ে পরের স্টপে নেমে যেত? নাকি বেকবাগান পর্যন্ত চলে যেত—সে বালিগঞ্জে যাবে কি ইছাপুর যাবে সে বিষয়ে সুরঞ্জনাকে অনিশ্চিত রেখেই। এমন কিছু অনিশ্চিতও নয় আবার। একদিনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পরদিন সকালেই অফিসে ফোন করে আলোকময় সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। বা তেমন অস্পষ্ট ছাড়াছাড়ি হলে, সকালে অফিসে এসে প্রথম সুযোগেই সুরঞ্জনা ফোনে আলোকময়ের সঙ্গে একটু কথা বলে নেয়। কিন্তু কাল তো সত্যি চিঠিটা শেষ পর্যন্ত আলোকময় হয়তো দিতেই পারত না। যদি দিতে না পারত, তা হলে আজ সকালে এই খামটা বের করে খামটার ভাঁজ এ রকম সোজা করতে হতো না। যদি দিতে না পারত, তাহলে আজ সকালে তাদের মধ্যে আবার ফোনে দিন স্থির হতো—কবে আবার সুরঞ্জনা গিয়ে হুইলারের সামনে দাঁড়াবে। হয়তো দুই-এক দিনই মাত্র দেরি হতো, কিন্তু আলোকময় তারিখ কেটে নতুন তারিখ লিখে পুরনো চিঠিটাই চালাত না। সে তা হলে নতুন তারিখ দিয়ে নতুন চিঠিই টাইপ করে আনত। আলোকময়ের কাজ খুব পরিষ্কার। এইটুকু একটা চিঠি আর-একবার ভালোভাবে টাইপ করতে তার সময়ই-বা কী লাগত, পরিশ্রমই-বা কী হতো। আর অত ভালো চিঠিটা সুরঞ্জনা কুঁচকে ফেলেছে।

সুরঞ্জনা দুই হাতে খামটা সোজা করে তার ফাইলগুলোর তলায় ঢুকিয়ে দেয়। ঐ চাপে খামটা আবার সোজা, অনেকটা সোজা হয়ে যাবে। আর সে পারে, নতুন একটা খামে ওপরে জেনারেল ম্যানেজারের ঠিকানাটা টাইপ করে, ঐ নতুন খামের ভিতর পুরনো চিঠিটা ভরে দিতে। এখানে ব্রাউন পেপারের প্লেইন খাম পাবে কোথায়? সবই তো বিরাট-বিরাট ছাপানো খাম। একটু খোঁজ করলে প্লেইন অফিসখাম একটা বের করা যায় না তা নয়। তা হলে তো একটু পরে সে চিঠিটা জমা দিলে যত কথা এই ঘরে উচ্চারিত হবে, তাতে এটুকুও যোগ হবে সুরঞ্জনা অফিসে এসে খাম জোগাড় করেছে। তার চাইতে আলোকময় যা দিয়েছে তাই থাক। সেটা ঐ ফাইলের ভারে সোজা হোক, সুরঞ্জনা এই স্যালারি সেভিংস-এর কাজ কাল যেখানে শেষ করেছে, আজ সেখান থেকে ধরল।

যদি ধরেও নেয়া যায় চিঠিটার কথা আলোকময় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভুলেই ছিল, সুরঞ্জনা তাকে মনে করিয়ে দেয়নি, কেন? বা, সুরঞ্জনা চিঠির কথা তোলেনি কেন? বা, সুরঞ্জনা চিঠি চেয়ে নেয়নি কেন? চিঠি নিয়ে তো অনেক ভেবেছে সুরঞ্জনা, অনেক। সে তো চিঠি চেয়ে নিয়ে, দেখে, পড়ে এ নিয়ে আলোকের সঙ্গে কথা শুরু করতে পারত। চিঠিটা তো তাকেই দিতে হবে, তার অফিস সামলাতে তো আলোকময় আসবে না, চিঠিটা নিয়ে তো সুরঞ্জনারই মাথাব্যথা বেশি থাকার কথা—যদি এসব চিঠি নিয়ে দু-পক্ষের কার মাথাব্যথা বেশি তা পরিমাপ করা যায়। তা হলে কাল সন্ধ্যায় ক্যান্টিনে ও রকম সময় নষ্ট না করে এ নিয়ে আলোকময়ের সঙ্গে দু-চার কথা বিনিময় করতে

https://boierhut.com/fb

পারত। এ রকম চিঠি দিলে বড়বাবু বা তাদের সাহেবের সেই মুহূর্তের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, তা নিয়ে আলোকময় তাকে প্রস্তুতি নেয়ার মতো কিছু আন্দাজ দিতে পারত। সুরঞ্জনা কেন চিঠিটি চেয়ে নিল না, সে পর্যন্ত চেয়ে নিল না, যে চিঠি তাকেই নিজ হাতে অফিসে জমা দিতে হবে, সে চিঠিটা শেষ পর্যন্ত আলোকের ব্যাগেই সে রাখতে দিল কেন? যেন, যদি ইতিমধ্যে বাস চলে আসত, থামত, সুরঞ্জনা চিঠিটা না চেয়েই উঠে পড়তে পারত ও আলোকময় চিঠিটা আর দিতে পারত না। আলোকময় কি তা হলে তাকে পরীক্ষা করছিল—সে চিঠিটার কথা বলে কি না। তা হলে সে চিঠির কথা না-বলতেই আলোকময় চিঠিটা দিয়ে দিল কেন? সে কি একমাত্র এই কথা বুঝে যাওয়ার পর যে সুরঞ্জনা আর চিঠির কথা কাল বলল না?

সুরঞ্জনা একটু সচকিত হয়। অফিসের ঘর ভরে গুঞ্জন উঠতে শুরু করেছে। কারো কারো উঁচু গলাও শোনা যাচ্ছে। জলের ছেলেটি সামনের লাইনে জল দিয়ে যাচ্ছে। যার যার আসার এসে গেছে। এখনো অনেকে ঢুকছে। সুরঞ্জনা চিঠিটা ফাইলের তলা থেকে বের করে নিজের সামনে খোলা স্যালারি সেভিংসের ফাইলের ওপর রাখে—খামটা সোজা হয়েছে, ওপরের দাগটা আছে। ওটা আর যাবে না।

সুরঞ্জনা একটু সচকিত হয়। এখন তো তার এই চিঠিটা বড়বাবুর কাছে বা সেকশন অফিসারের কাছে জমা দেয়ার কথা, বা জমা দেয়ার প্রস্তুতি নেয়ার কথা। তা না নিয়ে সে ভাবছে কেন, কাল এই চিঠিটা দিতে আলোকময় এত দেরি করল? কেন? সেই বা শেষ পর্যন্ত চিঠিটি চেয়ে নিতে পারেনি কেন? মনের কোনো ভিতরে কোনো দ্বন্দ্ব আছে নাকি সুরঞ্জনার? সে কি ভাবছিল, যদি শেষ পর্যন্ত আলোকময় ভুলেই যায়, তো যাক, অন্তত দুটো-একটা দিন তা হলে দেরি হবে? দেরি হলে, এই অফিসের প্রতিক্রিয়া, এই বাড়ির প্রতিক্রিয়া, এই দুটো দিন অন্তত বিলম্বিত হবে? পালাতে চাইছিল সুরঞ্জনা? নিজের কাছ থেকেই?

সুরঞ্জনা হেসে কথাটা উড়িয়ে দেয়। যে বাধ্যতা সে নিজের সমস্ত মন দিয়ে বোধ করে, তার অতিরিক্ত কোন বাধ্যতা আছে তার আলোকময়ের প্রতি? বা, আলোকময়ের তার প্রতি? সে তো ইচ্ছে করলেই এই চিঠিটা এখন, এখনই, কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ঝুড়িতে ফেলে দিতে পারে। বা, ছেঁড়ারও দরকার নেই, বাজে কাগজের মতো সে ফেলে দিতে পারে এই চিঠি তার ড্রয়ারে। বা, বাজে কাগজের মতোই এ-চিঠি পড়ে থাকতে পারে তার ব্যাগে, দুমড়ে-মুচড়ে, গামে-তেল-জলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সে নিজে ছাড়া কেউ তো তাকে বাধ্য করছে না। কোনো কিছুতে বাধ্য করছে না। সে তো অফিসের ফোন তুলেই আলোকময়কে এই মুহূর্তে বলে দিতে পারে, চিঠিটা সে দিতে পারছে না, কোনো দিনই আর দেবে না। আলোকময় একটি কথাও জিজ্ঞাসা করবে না, সুরঞ্জনা জানে, আলোকময় একটি কথাও জিজ্ঞাসা করবে না। তাদের এত দিনের সম্পর্ক যে-ভাবে তৈরি হয়েছে তাতে সুরঞ্জনার ঐ কথা বলা যেমন অবান্তর, আলোকময়ের তেমনি কিছু মনে করাও

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অবান্তর। এই চিঠি নিয়ে এত বছর ধরে তাদের এত কথা হয়েছে যে এই চিঠি নিয়ে আর নতুন করে বলার মতো কিছু নেই। রেজিস্ট্রেশনের পর থেকেই তো এই চিঠি দেয়ার কথা হয়ে আসছে। আইনত তো সুরঞ্জনা আর উইডো পেনশন নিতে পারে না। একবার কথা হয়েছিল ঐ পেনশন সে আর তুলবে না। না তুললেও এ নিয়ে তো কথা কানাকানি হবে। ইস্কাপনকে ভালো রেজাল্ট করানোর জন্যে তারা তখন কোনো নতুন ঝামেলায় নিজেরাও জড়িয়ে পড়তে চায়নি, ছেলেমেয়েদেরও জড়িয়ে পড়তে দেয়নি। তাই সে বা আলোকময় চিঠির কথা কাল তোলেনি। কাল চিঠির কথা কিছু তোলার ছিল না বলেই তারা তোলেনি। আলোকময় এসেই চিঠিটা দিলে সে যে-ভাবে ব্যাগে রাখত, আলোকময় বাসস্ট্যান্ডে এসে দেয়াতেও সে চিঠিটা সে-ভাবেই রেখেছে।

জলের ছেলেটা এসে গ্লাসে জল ভরে দেয় ও টেবিলে দুফোঁটা ফেলে। ড্রয়ার থেকে একটা ঝাড়ন বের করে টেবিলের জলটা মুছে সুরঞ্জনা একটু জল খায়, আবার ঢাকা দিয়ে রাখে।

ফাইলের মধ্যে চিঠিটার ওপর সে হাত বোলায়। অবশেষে আজ সে এই চিঠিটা দিতে পারছে, তাদের সম্পর্কের ঘোষণাপত্র, তার আর আলোকময়ের। এ সম্পর্ক সম্পূর্ণ তার নিজের তৈরি, কারো হাত ধরে সে আলোকময়ের কাছে পৌঁছয়নি, আলোকময়কে সে অর্জন করেছে।

তের

সুরঞ্জনা সেই প্রয়োজনীয় সহজ আত্মবিশ্বাস নিয়েই ফাইলের ভিতর রাখা খামটার ওপর হাত বোলায়, যেন সেই প্রক্রিয়ায় তার আত্মবিশ্বাসটা আর একটু দৃঢ় হয়ে ওঠে। চিঠিটা জমা দেয়ার আগে সচেতনভাবে তার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করার দরকার পড়ে যায়, নইলে অনেক কিছুই তো অভ্যেসে ক্ষয়ে যায়, এমনকি আত্মবিশ্বাসও। নিজেকে প্রস্তুত করে তোলার সেই আচম্বিত মুহূর্তেও সুরঞ্জনা সচেতন থাকে যাতে সে অকারণে কোনো পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ শত্রুর অবস্থান কল্পনা করে না নেয়। কে তার শত্রুতা করবে আর কে করবে না—এ কথার ওপর ভিত্তি করে তো তার আর আলোকময়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। এখন তাদের সম্পর্কের প্রতিক্রিয়ায় যদি কোনো শত্রুতা দেখা দেয়, সেটা নিশ্চয়ই সেই সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে না। সমাজ, অফিস, পরিবার এসব নিয়ে একবার কেন দশবার কথা উঠবে, দশজন কেন একশজন কথা তুলবে। সুরঞ্জনাও জানে যত সময় গেছে, সময় তত জটিল হয়েছে। সে যদি আজ থেকে পাঁচ বছর আগে এই চিঠি দিত তা হলে যেন

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তার চিঠি দেয়ার অধিকার আর একটু বেশি থাকত। তখন তার বয়স থাকত ছত্রিশ। ছত্রিশ বছরের একটি মেয়ের দ্বিতীয়বার বিয়ে করার অধিকার নিশ্চয়ই একচল্লিশ বছরের একটি মেয়ের চাইতে বেশি। কিন্তু তখন তার বয়স ছত্রিশ হলে, আলোকময়ের বয়স তো হতো বাইশ। বাইশ বছরের একটি ছেলেকে বিয়ে করার ভিতরে বালক—হরণের ঘটনা কেউ কেউ দেখতে পেতেন না? তা ছাড়া আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আলোককে বিয়ে করাটা তো সুরঞ্জনার কাছে গত্যন্তরহীন বাস্তব হয়ে ওঠেনি। সুরঞ্জনাকে তো আলোকের সঙ্গে বিবাহ সম্পূর্ণ করে দাম্পত্যে যেতে হচ্ছে।

চায়ের ছেলেটি এসে চা ঢেলে যায়। সুরঞ্জনা চিঠিটা ড্রয়ারের ভিতরে ফেলে রাখে। এখন সুষমাদি আসবেন। সুষমাদি প্রথম কাপ চা তার সঙ্গে খান। প্রথম কাপ—চা বিলির আগে সবাই ফাইল খুলে বসে না, অনেকে নিজের টেবিলেও বসে না। তখন অফিসে লোকজন আসতে থাকে। প্রথম কাপ চা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অফিসটা জমে যায়। চুপচাপ যে যার কাজ শুরু করে দেয়। দু-একজন একটু উঁচু গলায় কথা বলতে থাকে, সবাই সেটা উপেক্ষা করে। সেদিন সবচেয়ে লেট যারা, তারা এই সময়টায় এসে ঢোকে। এরপরে কেউ খুব একটা আসে না, নেহাত দূরের কোনো লোকাল ট্রেন অবরোধ-টবরোদের কারণে আটকা না পড়লে। সুষমাদি এসে সামনের চেয়ারে বসলেন। চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে বললেন, 'আরো ভালো মানুষের মতো থাক আর যত হাঙ্গামার কাজ তোর ঘাড়ে চাপবে। কদ্দূর এগোলি?'

'এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রত্যেকটা কেস দেখতে হচ্ছে, সময় লাগবে, আমি বড় বাবুকে বলে দিয়েছি, এ তো টাইম লাগবে। বড় বাবু বললেন, যা লাগবে তা তো লাগবেই, ধীরে ধীরে করুন।'

'আর-একজন কাউকে সাহায্য করার জন্যে নিলে হতো না?'

'না। তাতে বরং গোলমাল হওয়ার ভয় বেশি। আর একবার গোলমাল হলে সেটা খুঁজে বের করা তখন আরো ঝামেলা।'

'সামনের মাসে একই দিনে অনাদির গৃহপ্রবেশ সোদপুরে আর নিমাইয়ের ছেলের অন্নপ্রাশন সুভাষগ্রামে। কী করবি? যার বাড়িতে যাবি না, তারই তো মুখ গোমড়া হবে। একটা হলো নৈহাটি লাইনে, মানে নর্থে, আর একটা হলো সাউথে।'

'বাবা, যাওয়া হবে কী ভাবে?'

'সেসব প্ল্যান হয়ে গেছে। অনাদি বলেছে ও বারটার মধ্যে ফার্স্ট ব্যাচ বসিয়ে দেবে আমাদের দিয়ে। অনাদির ওখানে খেয়ে আধ ঘণ্টার মতো জিরিয়ে শেয়ালদায় ফিরে আসা হবে। তারপর বেলা তিনটের মধ্যে সুভাষগ্রামে নিমাইয়ের বাড়ি পৌঁছুতে হবে। নিমাই বলেছে পাঁচটার সময় ফার্স্ট ব্যাচ বসিয়ে দেবে আমাদের দিয়ে। তা হলে ছটা দশে একটা শেয়ালদার ট্রেন আছে সেটা ধরা যাবে। নিমাইয়ের বাড়ি নাকি স্টেশনের কাছেই। বাড়ি থেকে স্টেশনে আসতে টাইম লাগবে না।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সামনের মাসে এ রকম একটা সমবেত প্রোগ্রামে সুরঞ্জনার জায়গা থাকবে তো? সুষমাদি তখনো তাঁর সঙ্গে এ রকমভাবে কথা বলবেন? এতগুলো অনিশ্চয়তার সামনে সুরঞ্জনা জবাব দেয়, 'দুই বেলা নেমন্তন্ন খেয়ে পরের দিন তো আবার ছুটি নিতে হবে।'

সুষমাদি হেসে বলেন, 'নেমন্তন্নটা দেখছিস, পরিশ্রমটা দেখছিস না? সোদপুর থেকে সুভাষগ্রাম যেতে যেতে অনাদির খাওয়া হজম হয়ে যাবে, আবার নিমাইয়ের খাওয়া খেয়ে বাড়ি আসতে আসতে ঐ পাঁচটার খাওয়া হজম হয়ে যাবে। রাত্রিতে বাড়ি ফিরে আবার খেতে হবে', সুষমাদি হাসতে হাসতে চেয়ারের হাতলের ওপর ঢলে যান, আঁচল দিয়ে ঠোঁট ঢাকেন।

'আমি অনাদিবাবু আর নিমাইবাবুকে আগেই বলে রাখব, ছুটির দিনে ছেলেমেয়েকে সারাদিনের জন্যে বাড়িতে ফেলে যেতে পারব না। একজনেরটায় পারব, সে যদি ওরা ঠিক করে দেন কারটায় যাব।'

'সে কথা ঠিক। তোর ব্যাপারটা আলাদা। গেলে তা হলে ছেলেমেয়ে দুটোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।'

'হ্যাঁ। তাদের যেতে বয়ে গেছে।'

সুষমাদির চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তিনি কাপটা নিয়ে ওঠেন। সুরঞ্জনা বসে থাকে। সুষমাদি টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা কাগজ মুড়ে নিয়ে আসেন আবার। এসে সুরঞ্জনার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, 'এবারের সানন্দা। একজন কবরেজ লিখেছেন কী করে অম্বল সারে। বলেছেন ভাত খাওয়ার পর চুয়া মাখানো গুন্ডি দিয়ে পান খেলে অম্বল সেরে যায়। তুই বলছিলি, না একদিন, তোর অম্বলের কষ্ট হচ্ছে?

'সে তো দুই-এক দিন। তার জন্যে গুন্ডি খাওয়া অভ্যেস করতে হবে নাকি?'

'আচ্ছা রাখ না, পড়ে দেখিস। পড়তে তো আর আপত্তি নেই।' সুষমাদি কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে চলে যান। সুরঞ্জনা সেটা ড্রয়ারের ভিতর রেখে দেয়।

ড্রয়ার থেকে সেই চিঠির খামটা বের করে আবার ফাইলের ওপর রাখল সুরঞ্জনা। সে খামটার ওপর হাত বুলিয়ে দাগগুলোকে সমান করে দিল। তারপর খামটার মুখ আস্তে করে খুলল। একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিল সুরঞ্জনা—কেউ দেখছে কি না। কোনো কিছু গোপন করতে চাইছে সে তা নয়, কিন্তু আলোকময় তাকে দেয়ার পর এই প্রথম সে খামটা খুলে দেখছে। এটা তার একেবারে ব্যক্তিগত দেখা। এত বড় অফিসে, এত টেবিল, এত চেয়ার, এত লোকজন, তবু এর মধ্যে কারো কোনো ব্যক্তিগত কাজ করার উপায় নেই। একটা লেডিজ রুম আছে বটে, অনেকে সেখানে গিয়ে মাঝেমধ্যে চুল আঁচড়ে আসে, বা এমনকি, প্রসাধনও ঠিক করে নেয়। দুটো চেয়ার আছে, সেখানেও অনেকে কিছুক্ষণ বসে-বসে কাগজ-টাগজ পত্রিকা-টত্রিকা পড়ে। সেখানে গিয়ে তো আর সুরঞ্জনা এই চিঠি পড়তে পারে না।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সুরঞ্জনা খামের ভিতর থেকে চিঠিটা বের করে। তিন ভাঁজ করা। ভাঁজটা খুলে কাগজটা লম্বা করে। জেরক্সের কাগজটা মোটা, তাই ভাঁজটা শক্ত হয়ে পড়েছে। ভাঁজটা খোলার পরও দুদিকের টুকরো উঁচু হয়ে আছে। সুরঞ্জনা ডান হাতের আঙুলগুলো দিয়ে কাগজটাকে সোজা রাখে, তারপর ওপরের চিঠিটা পড়ে। ছোট চিঠি, সুন্দর করে টাইপ করা, কাগজটাও ভালো। সুরঞ্জনা বোঝে, এটা অফিসের কাগজ নয়। সুরঞ্জনা তাদের জেনারেল ম্যানেজারকে যথাযোগ্য সম্ভাষণের সঙ্গে জানাচ্ছে যে সে দু-বছর আগে এত তারিখে বিয়ে করেছে, সুতরাং সে আর বিধবা-পেনশন পেতে পারে না, 'ডিউ টু ইনঅ্যাডবার্টেন্ট সারকামস্টানসেস বেঅন্ড মাই কন্ট্রোল', সুরঞ্জনা এতদিন এই বিষয়টি জানতে পারেনি ও দু-বছর ধরে বিধবা পেনশন নিয়ে আসছে, সে, সুরঞ্জনা, জানাতে চায় যে তাকে যেন আর বিধবা পেনশন না দেয়া হয় ও সে দু বছরে যে পেনশন নিয়েছে তা সহজ কিস্তিতে তার মাইনে থেকে সমপরিমাণ টাকা কেটে যেন শোধ নেয়া হয়।

সুরঞ্জনা দ্বিতীয়বার চিঠিটা পড়ে। ভালো ড্রাফট করা, কোনো বাড়তি কথা নেই, কিন্তু চিঠিটিতে প্রয়োজনীয় সব তথ্যই একটু গম্ভীর ভাবে জানানো হয়েছে। সুরঞ্জনাকে সই করতে হবে। এই কথাটি আলোকময় বলে দেয়নি, সুরঞ্জনারও খেয়াল হয়নি। সে তো চিঠি না খুলতেও পারত। তা হলেও তো চিঠিটা আবার তার কাছে ফেরত আসত। সুরঞ্জনা চিঠির পাতা উল্টে পরের পাতাটা দেখে—সার্টিফিকেট অব ম্যারেজ। তার আর আলোকময়ের সই, ঠিকানা, তারিখ। সাক্ষীদের সই। রেজিস্ট্রারের সিল ও সই। আসল সার্টিফিকেটটায় কালির অনেক রং ছিল, জেরক্সে সব কালো হয়ে গেছে। সুরঞ্জনা বয়ানটা পড়ে, যে বয়ানের জোরে আলোকময় ও সে 'হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ।' সুরঞ্জনা আবারও সইয়ের কথা ভুলে চিঠিটা ভাঁজ করে ফেলেছিল। এ ভালো চিঠিতে কালির পেন দিয়ে সই করা উচিত ছিল। কালির পেন নেই। অগত্যা নিজের ডটপেনটা দিয়ে বাজে কাগজে দাগ টেনে দেখে নেয়, তারপর চিঠিটায় সই করে দেয়।

এবার চিঠিটা ভাঁজ করে ড্রয়ারে রাখতে রাখতে সুরঞ্জনা ভাবতে থাকে, কখন দেবে চিঠিটা আর কাকেই বা দেবে, বড় বাবুকে না সেকশন অফিসারকে?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চৌদ্দ

সুরঞ্জনা কাজে মন দিতে চায়, চিঠিটার কথা ভুলে সামনের ফাইলে সে চোখ ডোবাতে চায়। কখন, কার হাতে সে চিঠিটা দেবে এ নিয়ে সে কিছু ঠিক করতে পারেনি। কাজের ভিতর ঢুকে গেলে যেন কাজের ভিতর থেকেই একটা সমাধান বেরিয়ে আসবে। তাদের সেকশন অফিসার আসবেন দশটায়। সুতরাং ততক্ষণ অন্তত সুরঞ্জনা কাজ করা যেতে পারে, বা কাজ করতে করতেই চিঠিটা বড়বাবুর হাতে দেবে না অফিসারের হাতে দেবে, এ নিয়ে সাত-পাঁচ ভেবে যেতে পারে।

সুরঞ্জনার সামনে দুটো লম্বা শিট ছিল। একটা এসেছে জীবনবীমা অফিস থেকে। তাতে তাদের সেকশনের কে কবে স্যালারি সেভিং স্কিম অনুযায়ী জীবনবীমা করেছে তার একটা তালিকা আছে। কে কত টাকার বীমা করেছে সেই সংখ্যাটাও উল্লেখ করা আছে। আর একটা শিটে তাদের সেকশনের সমস্ত কর্মচারীর একটি তালিকা আছে, তাতে কার কত মূল বেতন তার উল্লেখ আছে। আর-একটা কাগজে জীবনবীমা অফিস থেকে জানানো হয়েছে—এই স্কিম বাবদ তারা এই অফিস থেকে কত টাকা কবে পেয়েছে। নিয়ম হলো প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক সেকশন থেকে একটা লিস্ট তৈরি হবে, তাতে এই স্কিমে কার কত টাকা কাটা হয়েছে তার বিবরণ থাকবে। সেই লিস্টটা প্রত্যেক মাসে জীবনবীমা অফিসে পাঠানোর কথা কি না, তা সুরঞ্জনা জানে না, তার জানার দরকারও নেই। জীবনবীমা অফিসে এই অফিস থেকে কিছু-না-কিছু টাকা অনিয়মিতভাবে জমা পড়েছে। এখন জীবনবীমার টনক নড়েছে যে এই টাকা যদিও জমা নেয়া হয়েছে, কিন্তু যারা পলিসি করেছে তাদের প্রত্যেকের নামে টাকা জমা পড়েছে কি না তার কোনো হিসেব কোথাও থাকছে না। ফলে কোনো বীমাকারীর যদি ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটে তা হলে এটা নিশ্চিত জানাই যাবে না যে তাঁর প্রিমিয়ামের টাকা ঠিকমতো জমা পড়েছে কি না। হয়তো এ ব্যাপারে জীবনবীমা অফিসের খুব একটা দোষ নেই, তাঁদের কাছে টাকা গেছে, তাঁরা জমা করে নিয়েছেন, সঙ্গে বীমাকারীদের তালিকা যাচ্ছে কি না সেটা তাঁরা আর দেখেননি, তাঁরা তো অফিসের নামে টাকা জমা করেছেন। সুরঞ্জনা তার কাজের অভিজ্ঞতা দিয়ে এটাও বোঝে যে টাকা জমা নেয়া হয় ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে বা অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে। আর সে-রকম কোনো নামের তালিকা গেলে সেটা জমা হবে অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে। বড় বড় অফিসে যেভাবে কাজ হয় তাতে এক ডিপার্টমেন্টের খবর আর-এক ডিপার্টমেন্টের পক্ষে রাখা অসম্ভব। সমস্ত ব্যবস্থাটাই তৈরি হয়েছে এই আন্দাজের ওপর যে যে অফিস থেকে টাকা পাঠানো হচ্ছে তারা নিশ্চয়ই কর্মচারীদের কাছ থেকে বীমা বাবদ কত টাকা কাটা হচ্ছে তার একটা তালিকা রাখবে। সুরঞ্জনা জানে না, হয়তো জীবনবীমার এই স্কিমের এটাই নিয়ম। কারো যদি জীবনবীমার টাকা প্রাপ্য হয় তা হলে হয়তো অফিস থেকে একটা সার্টিফিকেট নিতে হয় যে তার বীমা বাবদ তার মাইনে থেকে নিয়মিত কত টাকা কাটা হয়েছে। সুরঞ্জনা আন্দাজ করে যে এ রকম বা এ রকমই অন্য কিছু একটা নিয়ম হয়তো আছে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আছে। অর্থাৎ টাকা জমা পড়বে বীমা অফিসে, কার টাকা কত টাকা হলো তার হিসেব থাকে তাদের অফিসে।

এখন বিপদ হয়েছে, এই অফিস থেকে কোনো লিস্ট বের করা যাচ্ছে না। তা হলে কি এ রকম কোনো লিস্ট কোনো সময় তৈরিই হয়নি। তা হলে তো দায়িত্ব গিয়ে পড়ে যাদের এই লিস্ট তৈরি করার কথা তাদের ওপর? সম্ভবত অ্যাকাউন্টস সেকশনের ওপর? অ্যাকাউন্টস সেকশনও তাদের সুবিধে মতো যুক্তি দিয়েছে। গ্রুপ ইনসিওরেন্সের জন্যেও প্রতি মাসে কর্মচারীদের কাছ থেকে টাকা কাটার কথা। সেটাও নিয়মিত কাটা হয়ে আসছে। তার একটা তালিকাও আছে। অ্যাকাউন্টস সেকশন বলছে তারা বীমা অফিসের প্রাপ্য টাকা বীমা অফিসকে দিয়ে আসছে, বীমা অফিস তো একটা হিসেব রাখবে যে গ্রুপ ইনসিওরেন্সে কত টাকা জমা পড়ছে? আর স্যালারি সেভিংসে কত টাকা জমা পড়ছে আর যদি তারা টাকা পেয়ে থাকে, নামের লিস্টি না পেয়ে থাকে তা হলে এতদিন কি বীমা অফিস নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছে?

নাকে তেল দিয়ে বা না দিয়ে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও ঠিক যে ব্যাপারটা নজরে এসেছে বীমা অফিসেরই। তারাই সুরঞ্জনাদের অফিসকে জানিয়েছে। চিঠিপত্র চালাচালিতে কিছুটা সময় যায়, তাতে অবস্থা আরো ঘোলাটে হয়ে ওঠে। চিঠিতে কেউই কিছু না বলে পাশ কাটানোর চেষ্টা করে। শেষে, বীমা অফিসেরই কয়েকজন এ অফিসে এসে জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে, অ্যাকাউন্টস অফিসারের সঙ্গে কথা বলে, কাগজপত্র দেখে। তখন মুখোমুখি কথাবার্তায় বোঝা যায়, কারো কাছেই কোনো তালিকা নেই। কার দোষ, কার দায়িত্ব এসব নিয়ে সুরঞ্জনাদের অফিস আর বীমা অফিসের মধ্যে ঝগড়াঝাটিও হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু কথাটা রটে যায় যে স্যালারি সেভিংসে স্কিমের কোনো হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং কেউ কোনো টাকা পাবে না। ইউনিয়নগুলো এ নিয়ে যা যা করার সেই সব করতে শুরু করে। ইতোমধ্যে ঠিক হয়ে যায় যে অ্যাকাউন্টস সেকশনে তো প্রত্যেকের মাসিক মাইনের বিবরণ আছে, তাতে কার কাছ থেকে কী বাবদ কত কাটা হচ্ছে সেসবের নগদ হিসেব থাকে, সেই হিসেব থেকে এই অফিসের প্রত্যেক সেকশনে একটা তালিকা করে দেবে, তাদের কার কত টাকা স্যালারি সেভিংসে কাটা হয়েছে।

অ্যাকাউন্টস সেকশনে প্রত্যেক সেকশনকে সেই বিবরণ পাঠিয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে এখন প্রত্যেক সেকশনে তাদের তালিকা বানাচ্ছে।

সুরঞ্জনাদের এই সেকশনে মোট পঁয়তাল্লিশ জন কাজ করে। গত কয়েক দিনের কাজে সুরঞ্জনা পঁচিশজনের হিসেব ঠিক করতে পেরেছে। সারা দিনে পাঁচ-সাতজনের হিসেব ঠিক করতে পারলেই যথেষ্ট। মুশকিল হচ্ছে, কর্মচারীদের মাইনে থেকে টাকা কাটা হয় নানা খাতে। কারো কাটার সঙ্গে কারো কাটা মেলে না। একটা কোনো নিয়ম বের করে যে সবার কাটা পরীক্ষা করা যাবে তার

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কোনো উপায় নেই। তার ওপর আবার কারো সাইকেল অ্যাডভান্স, কারো স্কুটার অ্যাডভান্স, কেউ কোনো কারণে বেশি টাকা পেয়ে গিয়েছিল, কাউকে ভুল করে একটা টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কেউ প্রভিডেন্ট ফান্ডে বেশি করে টাকা কাটাচ্ছে—এসব তো আছেই।

একজনের অ্যাকাউন্টস দেখতেই যথেষ্ট সময় লাগে। তার ওপর যদি কোনো গোলমেলে হিসেব থাকে তা হলে সুরঞ্জনাকে সেটা একটা স্লিপে লিখে অ্যাকাউন্টস অফিসে গিয়ে বুঝে আসতে হয়। সে-রকম গোলমেলে হিসেব বেরোলে সারাদিনই একজনের হিসেব মেলাতে কেটে যায়। অ্যাকাউন্টস অফিস থেকে সুরঞ্জনাকে বলেছিল, যাদের হিসেবে গোলমাল আছে বলে তার সন্দেহ হচ্ছে সেগুলো আলাদা করে রেখে অন্যদের হিসেব শেষ করে ফেলতে, পরে গোলমেলে হিসেব নিয়ে অ্যাকাউন্টসের সঙ্গে বসলেই হবে। কথাটা হয়তো ঠিকই আর কাজটাও হয়তো তাতে এগোত। তবে সুরঞ্জনা সেটা করে উঠতে পারল না নেহার তার ব্যক্তিগত স্বভাবের জন্যে। এখানে তো প্রত্যেকের হিসেবের প্রত্যেক খাত আলাদা আলাদা ভাবে দেখতে হচ্ছে। দেখতে দেখতে সেই হিসেবের একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়তে হয়, আবার ফিরে আসতে হয় কখনো, আবার এগিয়ে যেতে হয় কখনো। এ রকমভাবে লিপ্ত থেকে একটা হিসেব শেষ করলে যেমন একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়, যাক, আরো একটা হিসেব শেষ হলো, তেমনি আবার এই প্রক্রিয়ায় সেই হিসেবটা মাথার ভিতর একেবারে সেঁদিয়ে যায়। এমনকি পরের হিসেবের ভিতর ঢুকলেও ঐ পুরনো হিসেবটাই মাথার ভিতর ঘুরে ফিরে আসে। তখন উঠে কারো টেবিলে গিয়ে একটু গল্প করে, অন্যরকম কথা বলে মাথাটাকে হালকা করে আসতে হয়। তার ওপর হিসেব যদি কোনো গোলমাল থাকে তা হলে সে হিসেব মাথা থেকে কিছুতেই বের হবে না। বারবার মনে হয়, এটা দেখা হয়েছে তো, ওটা দেখা হয়েছে তো? একটা জিনিসই বারবার ঘুরেফিরে দেখতে হয়। এ রকম একটা হিসেব অসম্পূর্ণ রেখে সুরঞ্জনা পরের হিসেবে ঢুকতে পারে না। তাই তার পক্ষে অ্যাকাউন্টসের পরামর্শ মতো—গোলমেলে হিসেবগুলো পরে একসঙ্গে নেয়ার জন্যে ফেলে রেখে দেয়া সম্ভব হয়নি। তা হলে সে এক কাজে একটুও এগোতে পারবে না। সুরঞ্জনা তাই যে হিসেব ধরছে, সেই হিসেবটা শেষ না করে ছাড়ছে না। দরকার হলে অ্যাকাউন্টসে যাচ্ছে। এমনকি কোনো কোনো দিন একটা হিসেব নিয়ে দু-দুবার অ্যাকাউন্টসে যেতে হয়েছে। অ্যাকাউন্টসে তার স্লিপটা রেখে অনেক সময় বলেছে, এটা থাক আমাদের কাছে, আপনি এর পরেরটা করুন তো। কিন্তু সুরঞ্জনা ছাড়েনি। সে অনেক সময় রেগে গিয়ে বলেছে, আমার কাজ আমার মতো করে করতে দিন, এটা দেখে দিন। বা একই কাজ একসঙ্গে করতে করতে পরস্পরের মধ্যে যে বোঝাবুঝি তৈরি হয় তার ভিতর থেকে বলে উঠেছে, একে তো আপাদের কাজ আমাদের কাঁধে চাপিয়েছেন, তার ওপর এটুকু দেখে দিতে পারবেন না? বা এমনও বলেছে, ঠিক আছে, আমি গিয়ে সেকশন অফিসারকে শিট ফেরত দিয়ে বলে দিচ্ছি আপনারা নেসেসারি ইনফর্মেশন দিচ্ছে না। তখন অ্যাকাউন্টরে লোক আবার সুরঞ্জনাকে

https://boierhut.com/fb

শান্ত করেছে, আরে বসুন দিদি, বসুন, এ যদি অফিসের কাজ হতো তা হলে কি আর কেউ এত মাথা ঘামাত? নিজেদের টাকা মার যাবে তাই মাতার ঘাম পায়ে ফেলছেন।

এইসব নিয়ে সুরঞ্জনা তার ফাইলের মধ্যে ডুবে যেতে চায়।

পনের

ঘণ্টা দুয়েকেরই হবে বোধ হয়, নিবিষ্ট কাজ করার পর ফাইল থেকে চোখ তুলে সুরঞ্জনা তাকায়, ঘরের লোকজনকে স্পষ্ট দেখতে পায় না, কেমন ঘোলাটে দেখায়। এতক্ষণ ধরে ঘাড় গুঁজে ফাইল দেখেছে, এখন চোখটা সইয়ে নিতে একটু সময় তো নেবেই। কাজের ভিতর দিয়ে যখন সময়টা পেরিয়ে যায়, তখন সময়টাকে বোঝা যায় না, নিজেরই ঠিক আন্দাজ আসে না কতটা সময় গেল। আবার একরকম ভাবে সে আন্দাজ শরীরের ভিতর, যা নিজের দৈনন্দিন অভ্যাসের ভিতর টেরও পাওয়া যায় নিশ্চয়। সে রকম একটা আন্দাজ থেকেই সুরঞ্জনা এতক্ষণ পর তার চোখ আর ঘাড়কে একটু বিশ্রাম দিতে ঘরের দিকে চাইল। এখন সে ঘরের দিকে তাকিয়েই সময়টা আন্দাজ করতে চায়।

ঘরের দৃশ্যটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে আসে। ডান দিকে একটু আবছা হয়ে গেছে। সেদিক থেকেই একটু চড়া গলার কথা আসছে, বোধ হয় অরবিন্দ আর বিমানের পার্টি নিয়ে ঝগড়া লেগেছে। প্রায় রোজই লাগে। প্রথম দিকে ওরা দুজন চেষ্টা করে কোনো তর্কাতর্কির মধ্যে না যেতে। পাশাপাশি যারা থাকে তারা ধীরে ধীরে ওদের উশকে দেয়। আর ওরাও রোজ নিয়ম মতো উশকে ওঠে। সুরঞ্জনা ওদের তর্ক কোনো দিনই শোনেনি, প্রতিদিনই তর্কের আওয়াজটা শুনেছে। তাতে ও বিশেষ কিছু বুঝে উঠতে পারেনি। এক অফিসে কাজ করতে করতে জানতে না চাইলেও যেমন সবার বাড়ির সমস্যা পর্যন্ত জানা হয়ে যায়, সে রকম সুরঞ্জনারও জানা হয়ে গেছে অরবিন্দ আর বিমানের পার্টি বিষয়ক তর্ক কী নিয়ে। ওরা দুজনে আগে একই পার্টি করত। এখানকার ইউনিয়নে দুজনে একই পার্টির নেতা ছিল। এখন নাকি বিমান বিক্ষুব্ধ হয়ে গেছে। বিক্ষুব্ধ হয়ে সে পার্টি ছেড়ে দিয়েছে বা বিক্ষুব্ধ হওয়ার জন্যেও পার্টি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তৎসত্ত্বেও বিমান ইউনিয়ন ছাড়েনি। তার প্রধান কারণ, এখানে অন্য যে দুটি ইউনিয়ন আছে, তার কোনোটিতে যাওয়া বিমানের পক্ষে সম্ভব নয়, একটা কংগ্রেসের, আর-একটা হালে হয়েছে বেনামিতে বিজেপির। সুতরাং বিমান পুরনো সিটু ইউনিয়নেই থেকে গেছে। এ রকম ভাবেই সুরঞ্জনা জেনে গেছে, ওদের রোজকার ঝগড়াও নাকি হয় এই ইউনিয়ন নিয়েই। বিমান মনে করে তাদের ইউনিয়ন আন্দোলন ভুলে গেছে, লড়াই ভুলে গেছে, এমনকি শ্রমিক-কর্মচারীদেরও ভুলে যাচ্ছে। তাদের এখন একমাত্র

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

উদ্দেশ্য মালিকের সঙ্গে বোঝাপড়া করে শিল্পে শান্তি রক্ষা করা। আর অরবিন্দ বলে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এখন আগের মতো আন্দোলন করলে শ্রমিক-কর্মচারীদের ক্ষতি হবে, আন্দোলনের কায়দা বদলেছে, সরকারের সমর্থনে মালিকের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে যতটা আদায় করে নেয়া সম্ভব ততটাই আদায় করা উচিত। মালিকের কাছ থেকে দাবি আদায় যেন ইউনিয়নের কাজ, তেমনি কারখানাটাকে রক্ষা করাও ইউনিয়নের কাজ। সুরঞ্জনা বোঝে না—ওরা রোজ যদি একই কথা বলে, তা হলে রোজই ওরা ঝগড়া করে কেন; ওদের ঝগড়া তো কোনো দিনই মিটবে না, তা হলে রোজ এই বেলা সাড়ে দশটা ওরা এ রকম চেঁচাতে শুরু করে কেন?

সুরঞ্জরা হয়তো খেয়াল করেনি, হয়তো ওদের এই রোজকার তর্কের চেঁচামেচিতেই তার মনোযোগের নিবিড়তা একটু ছিন্ন হয়েছে, আর তার পর সে নিজেই বোধ করেছে ঘাড় আর চোখটা টন টন করছে। ওদের তর্ক এ রকম চলতেই থাকবে। তার মধ্যেই অফিসের কাজ চলবে। ওরা কেউ কারো কাছে হার মানবে না। অনেকদিন সেই লাঞ্চ পর্যন্ত ওরা একভাবে চেঁচিয়ে যাবে। কোনো কোনো দিন আবার যারা উসকোয়, তারাই ওদের জোর-জবরদস্তি করে থামিয়ে দেয়। তখন ঝগড়া থামাতে তারা এত ব্যগ্র হয়ে পড়ে যে কেউ একজন বিমান বা অরবিন্দকে চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে ক্যান্টিনের দিকে চলে যায়। যাকে তুলে নিয়ে যায়, সে কিন্তু যতক্ষণ এই ঘরের ভিতর দিয়ে যায়, ততক্ষণ চেঁচাতে থাকে।

সুরঞ্জনা নিজের হাতের ঘড়ি দেখে না, অরবিন্দ আর বিমানের তর্কের আওয়াজ থেকে টের পায় সাড়ে দশটার বেশি বেজে গেছে। মনীষাদি ঘাড় গুঁজে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর পাশে জগদীশবাবু চেয়ারের ঘাড়ে এমনভাবে নিজের ঘাড়টা হেলিয়ে দিয়েছেন যে বোঝা যাচ্ছে না তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন কি না। তাঁকে ঘুমন্তই মনে হতো যদি দুই হাতে একটা কাগজ ফরফর না করত। কেষ্টবাবুর তেষ্টা গ্লাসের জলে মেটে না। তিনি একটা প্লাস্টিকের জাগ টেবিলের ওপর রাখেন। মাঝে মাঝে সেটা থেকে জল খাচ্ছেন। ঘরের পশ্চিম দিক থেকে আলোর রেখাটা জানলা দিয়ে একটু বেশি চওড়া হয়ে পড়ছে। সুরঞ্জনা নিজের হাতের দিকে না তাকিয়ে বুঝে ফেলে সাড়ে দশটা বেজে গেছে, এমনকি পৌনে এগারটাও হতে পারে। খুব ঘনঘোর বৃষ্টির দিন ছাড়া সময় বুঝতে অফিসে ঘড়ি দেখতে হয় না।

সুরঞ্জনা নিজের সামনে খোলা ফাইলটার দিকে তাকায়, যেভাবে সাঁতারু একদিকের পাড় ছুঁয়ে পিছন ফিরে তাকায়। সে আর একটা ফাইলের ভিতর ডুব দেবে? তা হলে লাঞ্চব্রেকের আগে আর মাথা তুলতে পারবে না। সুরঞ্জনা দ্বিতীয়বার ফাইলের দিকে তাকাল। তার মাথায় হিসেবটা তখনো গেঁথে আছে। সেই হিসেবের টানেই তার লোভ হলো আর-একবার ফাইলের ভিতর ঢুকে যেতে। তাহলে চিঠিটা সে কখন দেবে, কাকে দেবে—এসব নিয়ে লাঞ্চব্রেকে ভেবে ঠিক করে লাঞ্চের পর যা করার করবে। সুরঞ্জনা চিঠিটার দিকে তাকায়—খোলা ড্রয়ারে সবচেয়ে ওপরে চিঠিটা আলগোছে

https://boierhut.com/fb

পড়ে আছে। সুরঞ্জনাই ওভাবে রেখেছে, যে কোনো মুহূর্তে তুলে নিয়ে জমা দেয়া যাবে। কিন্তু আবার সেই মুহূর্তটাকে সুরঞ্জনাই পেছিয়েছে। সে এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি, চিঠিটা বড়বাবুকে দেবে, নাকি সেকশন অফিসারকে দেবে। সেই অনিশ্চয়তাতে তাকে অন্তত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা তো করতেই হয়েছে, সেকশন অফিসার তখন আসবেন। কিন্তু সুরঞ্জনা জানে, এই অনিশ্চয়তাটা অর্থহীন। বড়বাবুর কাছে দিলেও সে চিঠি সেকশন অফিসারের কাছে যাবে, সেখান থেকে আবার সেকশনে আসবে। অফিসারের কাছে দিলেও বড়বাবুর কাছে আসবে।

শেষ পর্যন্ত, এই সেকশনেই তো তার চিঠিটা প্রসেসড হবে, অর্থাৎ এখান থেকেই তার চিঠির ওপর নির্ভর করে যা করণীয় তা করা হবে। শেষ পর্যন্ত, এই সেকশনের সারি-সারি টেবিলের ওপর রাখা পাঁজা-পাঁজা ফাইলের ওপর তার চিঠি নিয়ে নতুন একটা ফাইল তৈরি হবে। শেষ পর্যন্ত, এই সেকশনের একটি লোকের কাছেও তার কথা গোপন থাকবে না, অ্যাকাউন্টসের কারো কাছে তার কথা গোপন থাকবে না, আসলে এই অফিসের কারো কাছেই তার কথা গোপন থাকবে না। তাদের অফিস এত বড় আর এখানে এত লোক কাজ করে যে কেউ কেউ এমন থাকতেই পারেন যাঁরা কারো কোনো খবরই রাখেন না, রাখতে চান না, কেউ তাদের কোনো খবর শোনালেও তাঁরা সে খবরটা বুঝে উঠতে পারেন না। এ রকম ব্যতিক্রম বাদ দিলে এ অফিসের সবার কাছে এখবর পৌঁছে যাবে যে স্বামীর মৃত্যুর পর, 'অন সিমপ্যাথিটিক গ্রাউন্ড' চাকরি পাওয়ার চৌদ্দ বছর পর, এক মহিলা নতুন করে বিয়ে করেছেন, যাকে বিয়ে করেছেন তার বয়স তাঁর থেকে চৌদ্দ বছর কম, মহিলার মেয়ের বয়স এখন উনিশ, ছেলের বয়স এখন চৌদ্দ, আর তাঁর বরের বয়স সাতাশ। এত বড় অফিসের সবাই তো আর সুরঞ্জনাকে চেনে না, কিন্তু এই কথা জানাজানি হয়ে গেলে অনেকেই, বেশির ভাগই তাকে একটু চিনে নিতে চাইবে যেন চৌদ্দ বছরের বৈধব্য যাপন করার পর যে ভদ্রমহিলা একচল্লিশ বছর বয়সে নতুন বিয়ে করতে চান তাঁর চেহারায় কিছু বৈশিষ্ট্য থাকেই। আলোকময়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা এই সেকশনের অনেকেই জানে, প্রায় সবাই জানে, এ নিয়ে একসময় খুব কানাকানিও হয়েছে। সেসব পার হয়ে এসে এখন আবার এক চরম প্রকাশ্যতায় যাবার পূর্বমুহূর্তে সুরঞ্জনা মাপতে বসে—এই যে এত সব লোকজন তার আবার বিয়ে করার কথা জানবে তারা সবাই-ই তো তাকে দোষ দেবে, তার দোষ নিয়ে অরবিন্দ আর বিমানের রোজকার তর্কের মতো তো কোনো তর্ক বাধবে না, কিন্তু বেশির ভাগ লোক তাকে দোষ দেবে কোন অপরাধের জন্যে। 'আমার অপরাধ তো কম নয়', ভেবে সুরঞ্জনা গোনে, বিধবা হয়ে বিয়ে করছ, বিধবা হওয়ার এতদিন পরে বিয়ে করছি, একচল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে করছি, উনিশ বছরের মেয়ে আর চৌদ্দ বছরের ছেলে নিয়ে বিয়ে করছি, আমার চাইতে চৌদ্দ বছরের ছোট একজনকে বিয়ে করছি, ইস্কাপনের সঙ্গে আলোকের বয়সের তফাৎ তো মাত্র আট বছরের, নিজের মেয়ের

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সঙ্গে যার বিয়ে হতে পারত, তাকে নিয়ে বিয়ে করছি। সুরঞ্জনা ভাবনা থামিয়ে ভাবে, তার আরো কোনো অপরাধ আছে কি না।

এই প্রক্রিয়ায় সুরঞ্জনা নিজেই নিজেকে যেন যাচাই করে নেয়। তারপর সোজা হয়ে বসে না, চিঠির ব্যাপারটা এখনই চুকিয়ে দেয়া দরকার। সুরঞ্জনা চেয়ারটা সরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ড্রয়ার থেকে চিঠিটা তুলে বেরিয়ে আসে। বড়বাবু আর অফিসার একদিকেই বসেন, যাঁকে পাবে তাঁর হাতেই চিঠিটা দিয়ে চলে আসবে।

ষোল

ডান হাতের ভিতরে চিঠিটা নিয়ে মুখোমুখি দুই সারি টেবিলের মাঝখানে যাতায়াতের ফালিটুকুতে পা দিতেই বাঁ কোনা থেকে সুষমাদি ডাকলেন, 'কোথায় চললি ওদিকে?'

এতক্ষণ তো ফাইলের ভিতর ঘাড় গুঁজে পড়েছিলি?'

সুষমাদির টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার জন্যে সুরঞ্জনাকে একটু পিছিয়ে যেতে হয়, 'এই এদিকে একটু যাচ্ছি, এই চিঠিটা দিয়ে আসি।' সুরঞ্জনা তৈরি ছিল সুষমাদি যদি জিগগেস করে কী চিঠি, কাকে দিচ্ছিস, তাহলে সে বলবে। কিন্তু অফিসে আসলে চিঠি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, কত চিঠিই তো কতজনকে লেখা হচ্ছে, কে আর অত খোঁজ রাখে। চিঠির কথা শুনে সুষমাদি বললেন, 'সানন্দটার তো পাতাও ওল্টালি না, ওটা আজকে বাড়িতে নিয়ে যাস, রাতে পড়ে কাল নিয়ে আসিস।'

সুরঞ্জনা হেসে ফেলে, 'আর বাড়ি নিয়ে যেতে হবে না, আমি এখানে বসেই পড়ে ফেলব, ঐ গুন্ডি খাওয়ার লেখাটা তো?'

'শুধু সেটা কেন? সবগুলোই পড়বি। বেড়াতে যাওয়ার একটা লেখা আছে, দেখবি কী ভালো, ফটোও আছে সঙ্গে।'

'আপনার কি সেই ফটো দেখে সেখানে বেড়াতে যাওয়ার শখ হয়েছে?' সুরঞ্জনা না-বলে পারে না, একটু হেসে।

'আমার তো সব সময়ই বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সঙ্গী পাই না। আবার জামাইটি হয়েছে হৈটিপুনি। ওর দৌলতে বছরে একবার বড় বেড়ানো হয়।'

'আর আমাদের সারা বছর সেই বেড়ানোর গল্প শুনতে হয়', বলে সুরঞ্জনা নড়ার ভঙ্গি করে। সুরঞ্জনার কথায় সুষমাদি হাসলেন, সুরঞ্জনাও হেসে আর-একটু সরে আসে, তারপর সোজা অফিসের পিছন দিকে হাঁটা দেয়। সুধাংশুবাবু আসছিলেন উলটো দিক থেকে। তিনি সুরঞ্জনাকে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দেখে হাসলেন, সুরঞ্জনাও হাসল। সুরঞ্জনা জানে, তার হাসিটা সুধাংশুবাবু দেখতে পেলেন না। তাদের এই ঘরে বড় দরজা পশ্চিম দিকে, ফলে আলোর একা বিভ্রাট হয়। যারা দরজার দিক থেকে ভিতরের দিকে আসে তাদের মুখ দেখা যায় না, এমনকি ঘরের ভিতর বেশ কিছু বাল্ব ও টিউব লাইট জ্বালানো থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় না। আর যারা ভিতর দিক থেকে বাইরে আসে তাদের সারা শরীর আলো পড়ে ঝলমল করে। সুধাংশুবাবুর হাসির উত্তরে সুরঞ্জনা না হাসলেও কোনো ক্ষতি ছিল না, সুধাংশুবাবু বুঝতেও পারতেন না। এ কথা সবার জানা থাকা সত্ত্বেও সবাই-ই হাসে।

এই ঘরের শেষে বড়বাবুর টেবিল, ঘরটা ডাইনে বেঁকেছে অফিসারের ঘরে। সুরঞ্জনা দূর থেকেই দেখে বড়বাবু চেয়ারে নেই।

বড়বাবুর টেবিলের সামনে সে একটু দাঁড়ায়। সুরঞ্জনার পিছন থেকে মণিবাবু জিজ্ঞাসা করে, 'কী ব্যাপার দিদি, বড়বাবু তো সাহেবের ঘরে গেলেন।'

সুরঞ্জনা মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'কতক্ষণ গেছেন? বেরোবেন এখনই?'

মণিবাবু জবাবে জানান, 'সে গেছেন কিছুক্ষণ। কখন বেরোবেন কী করে বলি।'

সুরঞ্জনা একটু সরে যায়, ঘরের মধ্যে কোথাও দাঁড়ানো মুশকিল, সামনে-পিছনে দুদিকেই টেবিল। সে একবার ভাবে ফিরে যাবে, পরে একসময় এসে দিয়ে যাবে। কিন্তু চিঠিটা দেয়ার জন্যে উঠে এতটা এসে আবার চিঠিটা নিয়ে ফিরে যেতে মন চাইছিল না। তা হলে কি বড়বাবুর টেবিলের ওপর রেখে চলে যাবে। নাকি অফিসারের ঘরে ঢুকে চিঠিটা অফিসারের সামনে রেখে বেরিয়ে আসবে? তাদের অফিসে নিয়মকানুনের কোনো বালাই নেই, তবু অফিসার যখন একজনের সঙ্গে কথা বলছেন, বিশেষত বড়বাবুর সঙ্গে, তখন অফিসারের ঘরে ঢোকাটা ঠিক নয়। দেখায়ও খারাপ, অফিসার রাগও করতে পারেন।

সব সত্ত্বেও এই চিঠিটা নিয়ে আবার তার চেয়ারে ফিরে যেতে চাইছিল না সুরঞ্জনা। চিঠিটা দিতে যখন এতটা সে এসেছে, চিঠিটা দিয়ে যেতেই চায়। সুরঞ্জনা যখন চিঠি দেয়ার পরের পর্বে ঢোকার জন্যে মনে মনে তৈরি হয়ে গেছে, সে আর সেই সময়টাকে পেঁচিয়ে দিতে চায় না। ওখানেই খানিকটা এদিক-ওদিক পায়চারি করে সুরঞ্জনা অফিসারের ঘরের দিকে চলে যায়।

পর্দা তুলে সে জিজ্ঞাসা করে, 'একটু আসব স্যার', তারপর যোগ করে, 'এই চিঠিটা দিয়েই চলে যাব।'

অফিসার চেয়ারে হেলান দিয়ে বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি সেভাবেই সুরঞ্জনাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কিসের চিঠি? আসুন।'

সুরঞ্জনা ভিতরে ঢোকে। বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে তাকে একটু হাসতে হয়। তারপর চিঠিটা অফিসারের সামনে রাখে। অফিসার চিঠিটা ধরেন না, সুরঞ্জনাকে বলে দেন, 'ঠিক আছে।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সুরঞ্জনা ঠিক এ রকমভাবে চিঠিটা দেবে ভাবেনি। সে ভেবেছিল, অফিসার তার সামনেই চিঠিটা খুলবেন ও পড়বেন। অর্থাৎ সুরঞ্জনা এটা নিশ্চিত জেনে যাবে যে তার চিঠিটা দেয়া হলো ও পড়া হলো। এরপর যা ঘটার ঘটবে। ফলে তাকে বলতে হয়, 'আমি কি চলে যাব স্যার?' ইচ্ছে করলে অফিসার এই কথার এমনও এক অর্থ করতে পারতেন যে সুরঞ্জনা চাইছে চিঠিটা তার সামনেই পড়া হোক। কিন্তু অফিসার তখন বড়বাবুর সঙ্গে কোনো একটা বিষয় নিয়ে কথায় ব্যস্ত ছিলেন আর তা ছাড়া সুরঞ্জনা অফিসে কী এমন চিঠি দেবে যা অফিসারকে তখনই খুলে পড়তে হবে? যদিও অফিসারের কাছে সরাসরি এ রকম লম্বা খামে ভরা চিঠি আসার কথা নয়, যা আসবে তা ফাইল হয়ে আসবে, তবে অফিসার সেসব কিছু না ভেবেই সুরঞ্জনাকে বলে দেন, 'ঠিক আছে, আপনি আসুন।'

সুরঞ্জনা পিছনে ফিরলে আবার বলেন, 'সেই এলআইসির ব্যাপারটা কদ্দুর হলো?' সুরঞ্জনা ঘাড় ঘুরিয়ে এইটুকু বলতে পারে, 'করছি স্যার।' 'আচ্ছা', শুনে সুরঞ্জনা পর্দা ঠেলে বাইরে আসে। তারপর নিজের টেবিলের দিকে হাঁটা দেয়।

মণিবাবু গলা তুলে জিজ্ঞাসা করেন, 'পেয়েছেন তো দিদি?' সুরঞ্জনা তাঁর দিকে তাকিয়ে ঘাড় হেলায়।

নিজের টেবিল পর্যন্ত দূরত্বটা সুরঞ্জনা মাথা নিচু করে হাঁটতে চায়, সে আঁচলটা দিয়ে পিঠ ঢাকে। পাশাপাশি টেবিলগুলো থেকে কেউ তাকে যেন ডেকে না বসে বা তার সঙ্গে কারো যেন চোখাচোখি না হয়। কিন্তু এখন তো পশ্চিমের দরজা দিয়ে খোলা আলোয় তাকেই স্পষ্ট দেখাচ্ছে, তার বিপরীত দিক থেকে যে আসছে তাকে স্পষ্ট দেখাচ্ছে না। সুরঞ্জনা ঘাড় হেঁট করে হেঁটে যায়, তেমন কারো সঙ্গে যেন তার হাসি বিনিময় করতে না হয়।

চেয়ারে ফিরে এসে সুরঞ্জনা এক ঢোঁক জল খায়। চিঠিটা দিয়ে ফেলার পর ভিতরে ভিতরে সে যে এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়বে, তা আগে ভাবেনি। তাহলে হয়তো অফিসের শেষেই চিঠিটা দিত, নিজের উত্তেজনা নিজের ভিতরে সামলাবার জন্যে সারাটা রাত পেত। কিন্তু অফিসের এত মানুষের মধ্যে যে উত্তেজনা তার হচ্ছে তা কি বাড়িতে সামলানো যেত? সুরঞ্জনা বুঝে নেয়, যখনই চিঠি দিত, তখনই তার এ রকম হতো। সে আগে এটা ভেবে রাখতে পারেনি—এই যা।

তাই এখন সুরঞ্জনা ভেবে রাখতে চায় এর পর কী কী হতে পারে। সে বেরিয়ে আসার পরই অফিসার অন্যমনস্কভাবে তার চিঠিটা খুলতে পারেন, বড়বাবুর সঙ্গে যে-কথা বলছিলেন, সেই কথা চালাতে-চালাতেই খুলতে পারেন, তারপর চিঠিটা পড়ে 'অ্যাঁ' করে উঠতে পারেন, বা নিজের প্রাথমিক বিস্ময়টা হজম করে বড়বাবুকে চিঠিটা ফাইল করতে দিয়ে বলতে পারেন, উনি আবার বিয়ে করছেন, তাই উইডো পেনশন আর নেবেন না। সুরঞ্জনা মনে মনে অফিসারের কথাটা

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সংশোধন করে, এ অফিসার খুব ভদ্র ও ঠাণ্ডা লোক, আবার বিয়ে করছেন—এই কথাগুলো যেন ওর মুখে মানায় না, উনি হয়তো বলবেন, রিম্যারেজ করেছেন।

সুরঞ্জনা ভাবে সে তার ফাইলের হিসেবের ভিতর আবার ঢুকে যাবে, তাহলে এই চিঠি নিয়ে নানা রকমের চিন্তা তার ভিতরে ঢোকার সুযোগ পাবে না। সে ফাইলটা টেনে নেয়, কোন পর্যন্ত তার দেখা হয়েছে সেটা বের করে। তার পরের লাইনটা একবার দেখে কিন্তু সেটা বুঝে উঠতে পারে না। চিঠিটা নিয়ে ভাবাটা তো নিরর্থক, সুরঞ্জনা ভাবে, সে এখানে বসে কী করে জানবে অফিসারের ঘরের ভিতর কী হচ্ছে। অফিসার এখনই চিঠিটা খুলতে পারেন, পড়তে পারেন, বড়বাবুকে দিতে পারেন। অফিসার চিঠিঠা না খুলেই বড়বাবুর হাতে তুলে দিতে পারেন, অফিসের কেউ তাঁকে এমনকি চিঠি দিতে পারে যা বড়বাবুর হাতে দেয়া যায় না? অফিসার চিঠিটা নাও খুলতে পারেন, বড়বাবুকে নাও দিতে পারেন, যে কাজ করছিলেন সেই কাজই করে যেতে পারেন, চিঠিটা পাশে সরিয়ে রেখে, পরে যখন নজরে পড়বে তখন খুলবেন, সুরঞ্জনা তাঁকে কী এমন চিঠি দিতে পারে, তাও ফাইল ছাড়া, যা তখনই দেখতে হবে?

সুরঞ্জনা প্রস্তুত হতে চাইছে। বড়বাবুর টেবিল থেকে যখন খবরটা পুরো সেকশনে মুখে-মুখে চাউর হয়ে যাবে তার পরবর্তী অবস্থাটা সে যাতে একা-একা সামাল দিতে পারে। তাকে কেউ কিছু বলতে পারে, নাও পারে, কিন্তু সুরঞ্জনা তো আর সবার চোখে পুরনো সুরঞ্জনা থাকবে না।

সতের

তার সামনে এমন একটা কাজ আছে যেটা অন্যমনস্কভাবে করা যাবে না, পুরো কাজটার ভিতর ঢুকে যেতে হবে—এটা এখন যেন সুরঞ্জনা নতুন আবিষ্কার করে, যা হবে, যখন হবে তখন দেখা যাবে। আলোকময়কে কি ফোনে জানিয়ে দেয়া দরকার যে সে চিঠিটা দিয়ে দিয়েছে? সে-রকম কোনো কথা তো আলোক কাল বলে দেয়নি। আলোক যদি ফোন করে তখন না হয় বলে দেবে। আলোক কি বলেছিল সে ফোন করবে? সুরঞ্জনা চেষ্টা করলে মনে আনতে পারত, কিন্তু সে সেই চেষ্টা করার বদলে তার ফাইলটার ওপর চোখ নামিয়ে আনে। যে পর্যন্ত এসে সে উঠে গিয়েছিল সেখান থেকে আবার সে ধরে। কার কোন মাসে কত টাকা বীমা বাবদ কাটা হয়েছে ও তার ভিতর গ্রুপ ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়ামের সঙ্গে স্যালারি সেভিংসের প্রিমিয়ামও যোগ করা হয়েছে কি না।

এগোতে-এগোতে সুরঞ্জনার একটা জায়গায় খটকা লাগে। সে আবার প্রথম থেকে দেখতে শুরু করে। তার খটকাটা সে নিজেই যদি দূর করতে পারে তাহলে আর অ্যাকাউন্টসে যেতে হবে না। আর অ্যাকাউন্টসে যাওয়ার আগে সুরঞ্জনার একবারের জায়গায় বারবার দেখতে চায় তার কোনো

https://boierhut.com/fb

ভুল হলো কি না, বা কোনো কিছু তার নজর এড়িয়ে গেছে কি না। অ্যাকাউন্টসের লোক যদি একবার সুরঞ্জনার কোনো ভুল ধরতে পারে তাহলে তাকে আর পাত্তা দেবে না। তখন সে কোনো সমস্যা নিয়ে গেলেই বলবে, আগে নিজে ভালো করে দেখুন, তারপর আমাদের কাছে আসবেন। কর্মী হিসেবে সুরঞ্জনার সেটুকু প্রতিষ্ঠা আছে বলেই সে গেলেই অ্যাকাউন্টসের লোক হেসে বলে, কী দিদি, আমাদের কোনো কেলো ধরলেন।

সুরঞ্জনা প্রথম থেকে দেখে, তার কোনো ভুল পায় না। সে একটা আলাদা কাগজে সংখ্যাগুলো লিখে লিখে আবার হিসেব কষে, কোনো ভুল ধরা পড়ে না, বারবার একই সংখ্যা আসছে। সুরঞ্জনা একটা আলাদা কাগজে পুরো সমস্যাটা লেখে। তার কাজের পদ্ধতি অনুযায়ী এখনই তার অ্যাকাউন্টসে যাওয়া উচিত। যাওয়ার জন্যে চেয়ারের হাতলে হাত দিয়ে ওঠার উদ্যোগও নেয় সুরঞ্জনা, তারপর গা ছেড়ে দেয়। এখন গেলে কোনো কাজ হবে না, লাঞ্চব্রেকের আগে অফিসে আর কাজের অবস্থা নেই। তাহলে তাকে লাঞ্চব্রেকের পর যেতে হয়। কিন্তু আজ কি তা যেতে পারবে সুরঞ্জনা। লাঞ্চব্রেকের পর কি অ্যাকাউন্টস পর্যন্ত খবর পৌঁছে যাবে না যে সুরঞ্জনা একেবারে ম্যারেজ সার্টিফিকেটের জেরক্সসহ চিঠি দিয়েছে যে সে আর উইডো পেনশন নেবে না। যদি অ্যাকাউন্টসে সে খবর পৌঁছয় তো পৌঁছুবে, তাতে সুরঞ্জনার অ্যাকাউন্টসে যেতে বাধা কোথায়। বরং সে প্রমাণ করতে পারবে, তার কাছে ঘটনাটা নাটকীয় কিছু নয়, নিয়মানুযায়ী যা জানবার সে সেটুকু অফিসকে জানিয়ে দিয়েছে এই মাত্র। কিন্তু ইতিমধ্যে কি এই সেকশনে কথাটা কানাকানি হয়ে গেছে? সুরঞ্জনা ফাইল থেকে চোখ তুলে পুরো ঘরটার ওপর একবার বুলিয়ে নেয়। কিছু বুঝতে পারে না। অনেকেই টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আছে। টিফিন ক্যারিয়ারগুলো ভিতরে ঢুকতে শুরু করেছে। ঘরের ভিতর খাবারের একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। যদি সুরঞ্জনার খবর কানাকানি হয়েও থাকে, খাওয়ার আগে তা নিয়ে কারো কোনো কথা বলার সময় হবে না। খাওয়ার পর টেবিলে মাথা দিলে ঘুম আসে। যা হওয়ার, তার পর হবে।

সে যাই হোক না কেন, এখন অ্যাকাউন্টসে যাওয়ার কোনো মানে নেই, সেখানেও এই একই অবস্থা, সকলেই খাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। সুরঞ্জনা কাগজটা চাপা দিয়ে রাখে, পরেই না হয় যাবে। তারপর সে ফাইলের পরবর্তী সংখ্যার দিকে তাকায় শুধু এই কারণে যে তা না করলে তাকে চেয়ারের হাতলে হাত রেখে সামনে তাকিয়ে থাকতে হয়, অথবা উঠে গিয়ে কারো টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একটু-আধটু গল্প করতে হয়। পরের সংখ্যাগুলো একবার পড়ে সুরঞ্জনা বোঝে, খাবার আগে সেই সংখ্যাপুঞ্জের রহস্যভেদ করাটা তার পক্ষে অসম্ভব। সে ফাইলটা বন্ধ করে পাশের ফাইলের স্তূপের ওপর রাখে। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে সামনে তাকিয়ে থাকে।

সুষমাদি রোজ টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে সুরঞ্জনার টেবিলে চলে আসেন, তারপর তাঁরা দুজন একসঙ্গে গল্প করতে করতে খান। ওদিকে অনিমা নিজের টেবিলে বসে খায় বটে, কিন্তু খাওয়ার

https://boierhut.com/fb

পরই সুরঞ্জনার টেবিলে চলে আসে। তিনজন মিলে খানিকক্ষণ গল্পগুজব হয়, তারপর সুষমাদি আর অনিমা নিজের নিজের টেবিলে ঘুমতে চলে যায়। সুরঞ্জনা এখন বসে আছে, কখন সুষমাদি তার টেবিলে আসেন তার অপেক্ষায়। সুষমাদি তার টেবিলে এলেই তাদের লাঞ্চ আওয়ার শুরু হয়। সুরঞ্জনা ভাবে, আজ যদি সুষমাদি না আসেন তাহলে বোঝা যাবে ইতিমধ্যেই তার কথাটা সবার জানা হয়ে গেছে এবং আপাতত সেকশনে তাকে একঘরে হয়েই থাকতে হবে। কিন্তু এতটাই কি হওয়া সম্ভব?

সুরঞ্জনা আড়চোখে সুষমার টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখে, সুষমাদি টেবিল ছেড়ে উঠে নিচু হয়ে মেঝে থেকে টিফিন ক্যারিয়ারটা তুলছেন। তার মানে সুরঞ্জনার টেবিলে আসছেন। সুরঞ্জনা চোখ সরিয়ে এনে চেয়ারের কাঁধে ঝুলিয়ে রাখা তার ব্যাগটা টেনে টেবিলের ওপর আনে। সুষমা এসে এখানে খান বলে সুরঞ্জনা টেবিলের সামনে কোনো ফাইল রাখে না, সে পাশে রাখে। টেবিলে ঐটুকু অংশ পাতার জন্যে একটা খবরের কাগজ সুরঞ্জনার তলার ড্রয়ারে তাকে।

সুষমা এসে টেবিলের সামনে দাঁড়ালে সুরঞ্জনা তলার ড্রয়ার থেকে সেই খবরের কাগজটা বের করে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পেতে দেয়। সেই কাগজের ওপর সুষমা টিফিন ক্যারিয়ারটা নামান তারপর নিজে চেয়ারে বসেন। টিফিন ক্যারিয়ারের হ্যান্ডেলটা কৌটো থেকে আলাদা করতে করতে সুষমা সুরঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'সুরঞ্জনা, তুই আর আজকে তোর খাবারটা বের করিস না, আমার সঙ্গে একটু মাছ-ভাত খা।'

সুরঞ্জনা হেসে বলে, 'তাহলে তো আমাকে হাফ সিএল নিয়ে বাড়ি চলে যেতে হবে। কতদিন অভ্যেস নেই দুপুরে ভাত খাওয়ার।'

টিফিন ক্যারিয়ারে বাটিগুলো বের করে টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে সুষমা বলেন, 'তোদের আজকালকার মেয়েদের শুধু ফিগার আর ফিগার। আরে ভাত খেলে যদি মোটা হতো তাহলে আমিও তো মোটা হতাম রে। আমি তো পারলে চারবেলা ভাই খাই।'

'সুরঞ্জনা হেসে উঠে তার টিফিন কৌটোটা বের করে ব্যাগটা আবার ঝুলিয়ে দেয়।

সুষমা একটা খালি বাটি তার সামনে নেন, তার পর চামচ দিয়ে ভাতের বাটি থেকে ভাত নিতে নিতে বলেন, 'তোকে তো কতদিন বলেছি, তোর টিফিন বাক্সে ঐ দুটো শুকনো রুটি আনার দরকার নেই। আমাকে রোজ একবাটি ভাত পাঠায়, আমি তো এতটা খেতেই পারি না। আমার ভাতেই তোর হয়ে যেত।'

সুরঞ্জনা তার টিফিন বাক্সটা খুলতে খুলতে বলে, 'শুকনো রুটি মানে? আমার কি আপনার মতো সেকেলে টিফিন ক্যারিয়ার। এটার মধ্যেই রুটি গরম থাকে, তরকারি গরম থাকে।'

'তোর তো রুটি-তরকারি, তাই ঐটুকুতে এঁটে যায়। আমাদের তো পঞ্চব্যঞ্জন বড় টিফিন ক্যারিয়ার না হলে চলবে কী করে?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'বড় টিফিন ক্যারিয়ারও এ রকম পাওয়া যায়, গরম থাকবে, দাম হয়তো একটু বেশি নেবে, কিন্তু দাম তো একবারই?'

'তোর যা বুদ্ধি', বলে সুষমা মুখের ভাত খেলেন, 'আমাদের টিফিন ক্যারিয়ার আনে বাঁকে ঝুলিয়ে এদিকে বুড়িটা, ওদিকে কুড়িটা। সেখানে ঠোকর খেয়েই তো ওসব জিনিস ভেঙে যাবে।'

'এগুলো কি প্লাস্টিকের? তা হলে অবিশ্যি ভেঙে যেতে পারে। আমার তো মনে হয় শক্তই।'

'দাঁড়া, তুই একটু মাছ খা। মাছের চচ্চড়ি রেঁধেছে, নে', সুষমা একটা ছোট গোটা মাছ সুরঞ্জনার দিকে বাড়িয়ে দেয়। সুরঞ্জনা হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে বলে, 'কী যে করেন, রুটি দিয়ে মাছ খাওয়া যায়?'

সুষমা বাটির মধ্যে ভাত মাখতে মাখতে বলেন, 'রুটি দিয়ে মাছ খাবি কেন, শুধু শুধু মাছটা খা না, ভালো রেঁধেছে। মাছের ঝোলও আছে। ঝোলের মাছ খাবি?'

'রক্ষে করুন। একটা মাছই যথেষ্ট।' সুরঞ্জনা একটু মাছ ভেঙে মুখে দেয়।

ঘরের ভিতর থেকে নানারকম খাওয়ার আওয়াজ উঠেছে। ভাত চিবুনোর আওয়াজ, টেবিলের ওপর বাটির ঘর্ষণ, বাটির সঙ্গে বাটির ঠোকাঠুকি, জল ঢালার ধ্বনি, জল গলায় ডেলে খাওয়ার শব্দ, কেউ চুমুক দিয়ে কিছু খাচ্ছে, কোথাও কেউ ঢেঁকুর তুলল। এর ভিতরই কোথাও কেউ উঁচু গলায় কিছু বলল, কেউ হেসে উঠল, দু-তিনজন মিলে একসঙ্গে কোনো কথা বলে উঠল। সব আওয়াজই খাওয়ার সঙ্গে যুক্ত। সমবেত খাওয়ার ভিতর যে অকৃত্রিম উল্লাস আছে, সেই উল্লাসের ধ্বনিই এই ঘরময় স্পন্দিত হচ্ছিল।

গল্প করতে করতে সুষমা আর সুরঞ্জনার খাওয়া শেষ হয়। সুরঞ্জনার হাত-মুখ ধোয়ার ব্যাপার নেই। সুষমাকে লেডিজ রুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আসতে হয়। ততক্ষণ টেবিলের ওপর এই এঁটো বাটিগুলো পড়ে থাকে। সুষমা এসে সেগুলোকে গুছিয়ে তোলেন। কাগজটা ভাঁজ করে সুরঞ্জনার হাতে দেন। সুরঞ্জনা সেটা তলার ড্রয়ারে রেখে দেয়।

অনিমা এসে একটা চেয়ার টেনে বসে। তারপর তাদের গল্প আবার নতুন মোড় নেয়। সুরঞ্জনা আন্দাজ করতে পারে, তার চিঠির কথা এখনো সেকশনের মধ্যে ছড়ায়নি, ছড়ালে এই খাওয়ার সময় সেটা নিশ্চয়ই টের পাওয়া যেত।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আঠার

কথাটা সেকশনের সবার ভিতর জানাজানি হয়ে গেল বোধ হয় বিকেলের দিকে, দুপুরের খাওয়ার পরে। সুরঞ্জনা কিছু টের পায়নি। খাওয়ার আগে তার ভিতরে যে-উৎকণ্ঠা ছিল সেটা খেতে খেতে, গল্প করতে করতে, খাওয়ার পরে আড্ডা মারতে মারতে কেটে গিয়েছিল। সুষমাদি আর অনিমা ঘুমতে যাওয়ার পরে সেও রোজকার মতো চেয়ারে একটু এলিয়ে বসে 'সানন্দটা দেখতে শুরু করে। সুরঞ্জনা দুপুরে ঘুমতে পারে না। তা ছাড়া এ রকম টেবিলে মাথা রেখে চোখ বুজে পড়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। এ রকম একটা নিয়ম সব সেকশনেই চালু আছে যে এই ঘুমবার সময় কেউ জোরে কথা বলবে না, বা কাউকে ডাকবে না, বা টেবিল-চেয়ার টানাটানির কোনো আওয়াজ করবে না। কেউ কেউ আবার তাদের টেবিলের কাছাকাছি আলো নিভিয়ে দেয়। তারা নিশ্চয়ই এই আধঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় সত্যিই একটু ঘুমিয়ে নিতে পারে। যারা ঘুমতে পারে না তারাও একটু বিশ্রামের আরাম পায়।

তারপর অফিস শুরু হলে সুরঞ্জনা সেই গোলমেলে কেসের স্লিপটা নিয়ে অ্যাকাউন্টসের দিকে হাঁটা দেয়। আজ অবিশ্যি সুরঞ্জনার মাথায় আর ঐ হিসেবের বোঝা নেই। সে বরং ঐ হিসেব থেকে একটু সরেই এসেছে। তবু ফাইলটা যখন আজকেও সে দেখছে, তার একটা অসন্তুষ্টি লেগেই থাকবে যদি ঐ গোলমেলে হিসেবটা ঐনা মেটে। কিন্তু অ্যাকাউন্টসে গিয়েও খুব সুবিধে হলো না। যে যে খাতা দেখলে এই সব গোলমালের একটা হদিস পাওয়া যায় সেসব খাতায় কিছু পাওয়া গেল না। তা হলে অন্য নথিপত্র দেখতে হবে। অ্যাকাউন্টসের ভদ্রলোক বললেন, আপনি আর বসে থেকে কী করবেন, স্লিপটা বরং থাক, কাল সকালে ফার্স্ট আওয়ারে আসুন, তখন দেখা যাবে। এই কথাটুকু শুনেই সুরঞ্জনা চলে এসেছিল। সত্যি তো, এখন বিকেলের দিকে সারা দিনের কাজ গুটোবার সময়, এখন এ রকম একটা হিসেবের রহস্য ভেদ করা যায় না। বরং এখন এসব নিয়ে বসলে নতুন ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু কাল যদি সুরঞ্জনা অফিসে আসতে না পারে? বাড়িতে গিয়ে ইস্কাপন আর তাতাকে বলবে। বাড়ির পরিস্থিতি তারপর কী দাঁড়াবে তা সে অনুমান করতে পারছে না।

সেকশনে ফিরে এসে নিজের টেবিলে বসতে যাবে এমন সময় মলয়বাবু হাসতে-হাসতে তার টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন, 'দিদি, কনগ্র্যাচুলেশনস, আমাদের খাওয়াচ্ছেন কবে?' কথাটা বলে তিনি হাসতেই লাগলেন। মলয়বাবু খুবই নিরীহ মানুষ, সব সময় পরিষ্কার জামাপ্যান্ট পরেন, ঠিক সময়ে অফিসে আসেন, ঠিক সময়ে যান, কোনো সাত-পাঁচ কথায় যাবেন না, সুরঞ্জনার সঙ্গে নেহাতই হাসি বিনিময়ের সম্পর্ক, তাও সব সময় নয়। মলয়বাবুর মুখে এই কথা শুনে সুরঞ্জনা তার কোনো মানে করতে পারে না, প্রথমে। সে মলয়বাবুর দিকে তাকিয়েই থাকে, সে যে বুঝতে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পারেনি এটা বোঝাতে। মলয়বাবু তাঁর ভদ্রতাসূচক হাসির সঙ্গেই বলেন, 'এইমাত্র শুনলাম, তারপরই আপনার সঙ্গে দেখা।'

এই কথাতে চকিতে সব কথার অর্থ সুরঞ্জনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সে মাথা নিচু করে হাতলটা ধরে চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে বসতে বসতে চেয়ারটাকে আবার সোজা করে নেয়। মলয়বাবু তখনো তার সামনে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখে। সুরঞ্জনা বুঝে উঠতে পারে না, মলয়বাবু নিরীহভাবে তার সঙ্গে কথা বলছেন, নাকি তাকে ঠাট্টা করছেন। মলয়বাবুর মতো মানুষ এ ব্যাপারে ভালোভাবে বা খারাপভাবে তার সঙ্গে কোনো কথা বলবেন—এটা সুরঞ্জনা ভাবতেই পারেনি। সে মলয়বাবুর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না, কিন্তু ময়লবাবুর উদ্দেশ্য বুঝবার জন্যে সে চোখটা তোলে। মলয়বাবু হেসে বলেন, 'আচ্ছা, সে পরে একদিন ঠিক করা যাবে। চলি।'

মলয়বাবু চলে যাবার পরও ময়লবাবুকে নিয়েই ভাবছিল সুরঞ্জনা। মলয়বাবু যদি তাকে ঠাট্টা করতেই এসে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে সুরঞ্জনার বিপদ আছে। এ ঘটনা যদি মলয়বাবুকে পর্যন্ত আলোড়িত করে থাকে, তাহলে সেকশনের সবাই-ই তার বিপক্ষে এটা ধরে নেয়া যায়। এমনকি সুষমাদি বা অনিমা বা মনীষাও এসে তাকে দুকথা শুনিয়ে দিয়ে যেতে পারে। বা হয়তো তারা সুরঞ্জনার সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দেবে। তাকে যদি সেকশনে এ রকমভাবে একঘরে করে তাহলে সুরঞ্জনা তার কাজ নিয়ে টেবিলে বসে থাকতে পারে। কিন্তু মলয়বাবুর মতো মানুষরা এসে যদি তার সঙ্গে এ রকম অনিশ্চিত ভাষায় কথা বলেন, তাহলে সুরঞ্জনা কী বলবে? সুরঞ্জনা তো বুঝতেই পারছে না কোন কথার কী উদ্দেশ্য?

ফাইলের ওপরই মাথা নোয়ানো ছিল সুরঞ্জনার। ফাইলের ওপর ছায়া পড়তে তাকে বাধ্যত চোখ তুলতে হয়। সুষমা দাঁড়িয়ে আছেন। 'সানন্দটা সুষমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সুরঞ্জনা বলে, 'এটা নিয়ে যান, পড়া হয়ে গেছে।'

সুষমা পত্রিকাটা নিয়ে হাতের ভিতর গোল পাকান, তার পর চেয়ারে বসেন। সুরঞ্জনা সুষমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে থাকে। সে মনে মনে সুষমার কথার জবাব দেয়ার জন্যে তৈরি হয়। সুষমা জিজ্ঞেস করে, 'তুই কি আজকেই চিঠি দিয়েছিস?'

'হ্যাঁ।'

'কখন দিয়েছিস?'

'এই সাড়ে দশটা-এগারটা হবে বোধ হয়।'

'কাকে দিয়েছিস?'

'অফিসারকে। তখন বড়বাবু সাহেবের ঘরেই ছিলেন।'

'আমাকে বলিসনি তো?'

'কী আর বলব? একদিন তো চিঠি দিতেই হতো। এমনিতেই দেরি হয়ে গেল।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'না। চিঠিটা আজকেই দিচ্ছিস, এই কথাটা বলতে পারতি।'

'না। সে-রকম কিছু মনে হয়নি। রোজই দেব-দেব ভাবি, আজ দিয়েই দিলাম।'

'তোর সঙ্গে চা খেলাম, তখনো কিছু বললি না। তোর সঙ্গে ভাত খেলাম, তখনো কিছু বললি না। আমাকে জানিয়ে রাখলে তোর কী ক্ষতি হতো?'

'না। লাভক্ষতির কোনো কথা না, আসলে মনে হয়নি। ভাবলাম, চিঠি দিলে সে চিঠি তো আর গোপন থাকবে না। সবাই জানতেই পারবে। যা হওয়ার তা হবে।'

'হবে আবার কী? ঐ মলয়বাবু এসে তোকে কী বললেন? ও তো কারো সঙ্গে তেমন একটা কথাও বলে না। অতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল।'

'আমি ঠিক বুঝলাম না। বললেন কনগ্র্যাচুলেশনস, আমাদের খাওয়াচ্ছেন কবে?'

'তুই কী বললি?'

'আমি ঠিক বুঝে উঠতেই পারলাম না উনি কী বলতে চাইছেন?'

'তোর কাছে খেতে চাইল আর তুই মানে বুঝতে পারলি না?'

'সে তো কেউ এমনিই খেতে চাইতে পারে, আমি কী বলব?'

'সেইটিই জিগগেস করলে পারতি, খেতে চাইছেন কেন?'

সুরঞ্জনা একটু চুপ করে থাকে। সে সুষমাদিকেও সম্পূর্ণ বুঝতে পারছে না। সুষমাদি তাকে কী বলতে চাইছেন, কেন বলতে চাইছেন তার একটা আন্দাজ সে তৈরি করতে চায় কিন্তু পারে না। আর সুষমাদির কথার জবাবে তো আর চুপ করে থাকাও যায় না। তাই সুরঞ্জনা সুষমাদির কথাগুলোর স্পষ্ট উত্তর দিয়ে যায়—দেখা যাক কোথায় গিয়ে শেষ হয়।

'সে আমি জিগগেস করব কেমন করে?'

'জিগগেস করে বুঝতি উনি কী বলেন?'

'উনি নিশ্চয়ই আজকের চিঠির কথাটাই বলতেন।'

'তাহলে আমি তোর এই চেয়ারটায় বসে থাকছি। মলয়বাবু পর্যন্ত যখন এসেছেন, তখন আরো অনেকে তোকে অভিনন্দন জানাতে আর খেতে চাইতে আসতে পারে। আসলে একটা মেয়েছেলে যে আবার বিয়ে করেছে সেইটাই এই সব বেটাছেলের সহ্য হচ্ছে না। হতো কোনো পুরুষ মানুষ, তাহলে ব্যান্ডপার্টি বাজানো হতো। আহা, বেচারার বৌ মারা গেছে, সারা জীবন কী করে একা-একা কাটাবে। আর বিধবা হয়েছিস তো মর, সারা জীবন একাদশী করে কাটা। যা করছিস ভালো করেছিস, সুরঞ্জনা। কিছু ভয় পাস না। এসব দুদিনে কেটে যাবে।'

সুরঞ্জনার চোখে জল এসে গিয়েছিল। সে কান্নাটাকে ঠেকাতে দুই ঠোঁট টিপে ধরে, নাকের পাশের পেশি শক্ত করে। একবার জল বেরোতে শুরু করলে সে ঠেকাতে পারবে না আর সেটা বড় লজ্জার ব্যাপার হবে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

জোর করে হেসে সুরঞ্জনা বলতে পারে, 'আপনি কি এখানে বসে বসে আমাকে পাহারা দেবেন?' সুরঞ্জনার চোখের কান্না গলায় আসে।

উনিশ

এখন পশ্চিমের দরজা দিয়ে এই ঘরের মধ্যে রোদ ঢুকছে। বাইরে থেকে যারা ভিতরে ঢুকছে তাদের মুখ দেখা যাচ্ছে না আর ভিতর থেকে যারা বাইরে যাচ্ছে তাদের গায়ে-মুখে সরাসরি রোদ পড়ছে। সুষমা দরজার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন আর আলগা কথা বলছিলেন সুরঞ্জনার সঙ্গে। সুরঞ্জনা সামনে ফাইলটা খোলা ছিল, সে মাঝেমধ্যে ফাইলের দিকে তাকাচ্ছিলও কিন্তু ফাইলের কিছু দেখছিল না। এখন ফাঈলটা গুটিয়ে রাখতে পারে, আজ আর কোনো কাজ হবে না। ফাইলটা গুটিয়ে রাখলে সুষমা আর সুরঞ্জনার মুখোমুখি বসে থাকার যেন কোনো ছুতো থাকে না। আর তাহলে সুরঞ্জনার মনে হবে, তার চিঠি নিয়ে সেকশনের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় সে যেন বসে আছ, সামনে সাক্ষী বসিয়ে রেখেছে সুষমাকে। ঘটনাটা বস্তুত তাই-ই। মলয়বাবুর কথার পরে সুষমার এখানে এসে বসাটা তো তার চিঠির প্রতিক্রিয়ারই দুটি ঘটনা। এমনকি সুষমার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও তো সুরঞ্জনা নিশ্চিত ছিল না, সুষমার কথাগুলো প্রথম দিকে বুঝতেও পারেনি। সুরঞ্জনা একবার ভেবেছিল, বলে, সুষমা এখানে বসে বসে 'সানন্দা' পড়ুক, সে না-হয় ফাইলের আর দুটো-একটা কেস শেষ করুক। সেটা বললে খারাপ শোনাবে কি না তা না ভেবেও সুরঞ্জনা সুষমাকে কিছু বলে না। সে এখন চেষ্টা করলেও ফাইলের হিসেবের ভিতর ঢুকতে পারবে না। ফাইলটা সামনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকাটা তার পক্ষে আরো কঠিন হতো। সুষমা এখানে বসে থেকে বরং সুরঞ্জনার চেয়ারে বসে থাকাটাকে সহজ করে দিয়েছেন।

কখন অশোক এসে টেবিলে দাঁড়িয়েছে তা ওরা খেয়াল করেনি। অশোক বোধ হয় বাইরে গিয়েছিল, ফেরার পথে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, 'কী সুষমাদি, নিজের টেবিল ছেড়ে অন্যের টেবিলে কী হচ্ছে?'

সুষমা মুখ না তুলেই বলেন, 'তোমাকে কি চৌকিদার রাখা হয়েছে কে কোন টেবিলে যাচ্ছে দেখতে।'

'বা বা? কী ব্যাপার? সুষমাদি এত খেপে গেছেন। কী হয়েছে সুরঞ্জনাদি।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সুরঞ্জনা একটু হাসার চেষ্টা করে, 'কই, কিছু তো হয়নি।'

অশোক সুরঞ্জনাকে জিগগেস করে, 'আপনার খবর কী?'

সুরঞ্জনা বুঝতে পারে না অশোক সব জেনে বলছে, নাকি না জেনে বলছে। মলয়বাবু পর্যন্ত যখন জেনে গেছেন তখন অশোকের পক্ষে না জানাটা অস্বাভাবিক। সুরঞ্জনার মুখটা শক্ত হয়ে যায়, 'আমার খবর সব সময়ই ভালো।'

অশোক হো হো করে হেসে ওঠে, এটা একেবারেই কারেক্ট কথা বলেছেন। যাদের খারাপ থাকার টাইম থাকে তারাই খারাপ থাকে।'

অশোক একটু জোরেই হাসে, জোরেই হেসেছিল। অশোকের হাসি শুনে সুরঞ্জনা একটু শক্ত হয়ে যায়। যারা অশোকের কথা শুনতে পায়নি অথচ হাসি শুনতে পেয়েছে তারা তো ভাবতে পারে অশোক সুরঞ্জনার চিঠির ব্যাপার নিয়েই সুরঞ্জনার সামনে হেসে ওঠার সাহস দেখাচ্ছে। সুরঞ্জনা আর অশোক যে একই কথায় হাসছে তা প্রমাণ করার জন্যে সুরঞ্জনাও বানিয়ে হেসে ওঠে, আচমকা। তারপর আঁচল দিয়ে মুখ মোছে।

সুষমা অশোকের দিকে ঘাড় উঁচিয়ে বলেন, 'তোমার আবার এত অট্টহাস্যের কী হলো এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে? নিজের টেবিলে যাও না।'

'শুনলেন না সুরঞ্জনাদি কেমন বললেন, তাঁর খবর সব সময়ই ভালো, খারাপ থাকার টাইম নেই। কজন এমন কথা জোরের সঙ্গে বলতে পারে, বলুন তো? আপনি পারবেন?'

সুরঞ্জনা ভাবে অশোক কি তাহলে চিঠির ব্যাপারটা মাথায় রেখেই তাকে বা তাকে নিয়ে এসব বলছে। ততক্ষণে সুষমা অশোককে বলছেন, 'একজনের ভালো থাকার খবর পেলে বুঝি ও-রকম হাসতে হয়?'

অশোক সুষমার কথা শেষ না হতেই বলে ওঠে, 'তাহলে একজনের ভালো থাকার খবর পেলে কি কাঁদব নাকি? আপনি তাই করেন?' অশোকের গলায় ঝগড়ার সুর স্পষ্ট হয়। সুরঞ্জনা একটু ভয় পায়, তার টেবিলের সামনে যদি ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়, সেটা আজ বড় বিশ্রী ব্যাপার হবে। সে একটা কোনো কথা ভাবে যা দিয়ে এই ঝগড়ার সুরটা কাটিয়ে দেয়া যায়। সে-রকম কোনো কথা তার মনেও পড়ে না আর সে বুঝতেও পারে না, তার কথা বলা আজ এখন ঠিক হবে কি না।

মন্মথ আর জিতেন এসে অশোকের পাশে দাঁড়ায়। মন্মথ বলে, 'আজ কি আড্ডা এই টেবিলের সামনেই জমবে নাকি?'

সুষমা বলে, 'তোমরা হঠাৎ আড্ডার খোঁজে বেরিয়েছ নাকি?'

মন্মথ বলে ওঠে, 'আপনাকে দেখেই তো এলাম, বুঝলাম, আজ এই টেবিলেই আসর জমবে।'

সুষমা জিগগেস করেন, 'কেন, রোজ কি তোমরা আমাকে দেখেই আড্ডার জায়গা ঠিক করো? আজ হঠাৎ আমি কোথায় বসে আছি সেদিকে দৃষ্টি কেন।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তোমাদের তো প্রত্যেকেরই ঠেক আছে, সেখানে কি আজ পাত্তা পাচ্ছ না?'

জিতেন সুরঞ্জনাকে বলে, 'সুরঞ্জনা, সুষমাদি কি আজ রেগেই আছেন, নাকি আমাদের দেখে রেগে গেলেন?'

সুরঞ্জনা তার ফাইলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করে। তার হাসির চেষ্টাকে অবান্তর করে দিয়ে অশোক বলে, 'চটেই আছেন, আমার ওপরও চটেছেন।'

মন্মথ জিজ্ঞাসা করে, 'আপনারা কি কোনো সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে কথা বলছিলেন, আমরা এসে ডিস্টার্ব করলাম।'

সুষমা বলেন, 'তা যদি বোঝোই তাহলে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

সুরঞ্জনার কোনো সন্দেহ থাকে না যে এঁরা প্রত্যেকেই তার ঘটনাটা জেনে এখানে এসেছেন ও তাঁরা যেসব কথা বলছেন তাতে অনেক সময়ই সেই ঘটনারই ইঙ্গিত থাকছে। মলয়বাবু পর্যন্ত জেনে গেছেন সুষমাদি জেনেছেন, আর মন্মথ, জিতেন, অশোক এরা জানেন না সেটা অসম্ভব। এরা যে তাকে আপত্তিকর কিছু বলছেন তা নয়, তার পক্ষে অসম্মানজনকও কিছু ঘটছে না। তবে তার টেবিলের সামনে এই ভিড় করে দাঁড়ানো, এই জোরে-জোরে কথা বলা, কখনো কখনো হেসে ওঠা—এটাই তো একটা বিশ্রী ব্যাপার। সুরঞ্জার সামনে আসার একটা ছুতো খুঁজছিলেন এরা, সুষমাদি বসে থাকাতে সেই সুযোগটা পেয়ে গেছেন।

কিন্তু সুষমাদি আছেন বলে তো সুরঞ্জনা খানিকটা পরিত্রাণ পাচ্ছে। সুষমাদি যদি এখানে বসে না থাকতেন তাহলেও এরা কি অন্য কোনো ছুতোয় সুরঞ্জনার টেবিল ঘিরে এ রকম দাঁড়িয়ে এইসব কথা বলতেন যার অনেক রকম মানে হয়। সুরঞ্জনা যদি এখন চেয়ার ছেড়ে উঠে টেবিল থেকে চলে যায় তাহলেও কি এরা এখানে থাকবেন? নাকি সুরঞ্জনার পিছনে পিছনে যাবেন? না, সুরঞ্জনা একটু বেশি ভেবে ফেলেছে। সে বরং এখন বড়বাবুর কাছে গিয়ে বলতে পারে, আমি আজ এখন চলে যাচ্ছি। সুরঞ্জনার চাইতে আর কে বেশি জানে যে আজ সে এক মিনিট আগেও অফিস ছেড়ে যেতে পারে না।

একটা দূরের টেবিল থেকে ডাক আসে, 'এই অশোক, মন্মথ, আসবে একটু এখানে?' ডাক শুনে সবাই তাকিয়ে দেখে তমাল হাত দিয়ে ডাকছে। সুরঞ্জনার টেবিলের সামনে থেকে মন্মথ হাত তুলে জানায় যাচ্ছে, তারপর, সুরঞ্জনার টেবিলটা খালি করে ওরা চলে যায়। তমাল কি ইচ্ছে করে ওদের ডেকে নিয়ে এই ভিড়টা ভেঙে দিল নইলে ওদের ভিড় দেখে তো এই ভিড়টা আরো বাড়ত। তমাল কি ওদের কোনো দরকারেই ডাকল, নাকি সে পরোক্ষভাবে সুরঞ্জনাকে একটু সাহায্য করতে চাইল? সুরঞ্জনা সে রকমই ভাবতে চায়। উত্তেজনায়, আর হয়তো উদ্বেগেও, সে অনেক সময় অনেকরকম ভেবে ফেলছে কিন্তু তাকে নিয়ে কি-ই বা এমন হতে পারে। মলয়বাবুর মতো বোকা লোক দু-একজন একটু বোকার মত কথা বলতে পারেন, বা এদের মতো কেউ কেউ একটু ইঙ্গিত দিয়ে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কথা শোনাতে পারে। এত সহকর্মীর মধ্যে তার পক্ষেও তো নিশ্চয়ই কেউ কেউ থাকবেন। সে যা করেছে তা করা উচিত কি না এ নিয়ে তার আড়ালে হয়তো অনেক তর্ক-বিতর্ক হবে। তা তো হতেই পারে।

অফিস শেষ হওয়ার অন্তত আধঘণ্টা আগে থেকে অফিস খালি হতে শুরু করে। যাদের ট্রেন ধরার থাকে তারা নির্দিষ্ট সময়ে বেরিয়ে যায়। অনেকের বাস ধরারও নির্দিষ্ট সময় আছে। তারাও বেরিয়ে যায়। আবার দু-একজন আছে যারা অফিস শেষ হওয়ার বেশ খানিকটা পরে অফিস থেকে বেরোয়। তাদেরও নির্দিষ্ট বাস বা ট্রেন ধরার থাকে।

সুষমা একটু আগেই বেরিয়ে যান আর সুরঞ্জনা বেরোয় টাইম মতই। আজ সুষমা জিগগেস করেন, 'তোকে কি বাড়ি পৌঁছে দেব?'

সুরঞ্জনা হেসে ফেলে, 'সে কী? কেন? আমার বাড়িতে যেতে চান চলুন, পৌঁছে দেয়ার কী আছে?'

'তাহলে তুই আমাদের সঙ্গেই বেরো', সুষমা নিজের ব্যাগট্যাগ নিয়ে তৈরি হন। সুরঞ্জনাও ভাবে, এটুকু আগে বেরোলে কোনো ক্ষতি নেই। তবে তারা তো গেট পর্যন্তই একসঙ্গে যাবে, তারপর তো সুষমাদি বড় রাস্তা ধরবেন আর সুরঞ্জনা কোয়ার্টারে রাস্তা ধরবে।

অফিস থেকে বেরিয়ে সুষমা বলেন, 'কাল অফিসে আসিস।'

'হ্যাঁ, আসব তো বটেই।'

'সুরঞ্জনা হাঁটতে হাঁটতে প্রস্তুতি নেয়—আজ বাড়ি ফিরেই ইস্কাপনকে আর তাতাকে বলবে। যা হওয়ার আজই হোক। ইস্কাপনকে বলা সোজা, কিন্তু তাতাকে কীভাবে বোঝাবে?

কুড়ি

বেল টিপতেই ইস্কাপন দরজা খুলে দিল। সুরঞ্জনা জিগগেস করে, 'কীরে কৌশল্যা চলে গেছে?'

'হ্যাঁ এই গেল', বলে ইস্কাপন আবার ভিতরে ঢুকে যায়। সুরঞ্জনা দরজা বন্ধ করে ইস্কাপনের পিছু পিছু ঘরে ঢোকে। প্রথম ঘরটায় তাতা মেঝের ওপর বসে অনেক খাতা আর বই ছড়িয়ে কিছু একটা করছে। সুরঞ্জনা দ্বিতীয় ঘরটায় ঢোকে। সুরঞ্জনার চৌকির ওপর শুয়ে ইস্কাপন কোনো একটা বই পড়ছিল, এখন বইটা নিয়ে পাশের ঘরে যাচ্ছে দেখে সুরঞ্জনা বলে, 'যাচ্ছিস কেন, পড় না?'

https://boierhut.com/fb

দরজায় ইস্কাপন মায়ের গলা শুনে দাঁড়ায়, 'দাঁড়াও আসছি।' ইস্কাপনকে সেটুকুও সময় না দিয়ে সুরঞ্জনা আঁচল দিয়ে ঠোঁট আর কপালটা মুছতে মুছতে বলে, ইস্কাপন, আজ আমি অফিসে সেই চিঠিটা দিয়ে দিলাম।' যেন এটুকু বললেই ইস্কাপন বুঝবে কোন চিঠি, কী ব্যাপার। ইস্কাপন বাইরে যাচ্ছিল, সে অর্ধেক ঘুরে চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'কী চিঠি? অফিসের?'

কপাল আর ঠোঁটের ঘাম মুছে আঁচলটা কোলের ওপর নামায় সুরঞ্জনা, পাশে তার অফিসের ব্যাগ, অফিস থেকে ফেরা তার এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, অফিস থেকে ফিরে সে যে এক গ্লাস জল খায় তাও খায়নি, জল খাওয়ার পর তার হাতমুখ ধুতে বাথরুমে ঢোকার কথা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এক কাপ চা করে খাবে। আজ সেসব কাজ স্থগিত রেখে সে অফিসের পোশাকে, অফিসের মুখ নিয়ে, অফিসের ব্যাগ পাশে রেখে ইস্কাপনকে বলে, 'আমি অফিসকে জানিয়ে দিলাম আমি আর উইডো পেনশন নেব না।'

দুই ঘরের মাঝখানের দরজায় ইস্কাপন পুরো ঘুরে দাঁড়ায়। সে তার বয়সের তুলনায় বেশি চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'কেন? উইডো পেনশন নেবে না কেন?'

সুরঞ্জনার কোলের ওপর দুই হাতেই তার আঁচলটা ধরা ছিল। একটু কুঁজো মতো হয়ে সে বসেছিল। সে ভাবেই বসে থেকে সে ইস্কাপনের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলে, 'আইন অনুযায়ী রিম্যারেজ করলে উইডো পেনশন আর নেয়া যায় না। আমি দু-বছর বেআইনিভাবে এই পেনশন নিয়ে যাচ্ছি। এই দু বছরের টাকাও আমি ফেরত দিয়ে দেব বলেছি।'

'কেন? তোমরা কি বিয়ে করেছ?'

'হ্যাঁ। তা না হলে আর চিঠি দেব কেন?'

'দু বছর আগেই?'

'হ্যাঁ, দু বছর আগে।'

'তাহলে তখন জানাওনি কেন?' ইস্কাপন দরজা থেকে এগিয়ে আসে সুরঞ্জনার মুখোমুখি, আর গলা চড়ে যায়।

সুরঞ্জনা একই স্বরে জবাব দেয়, 'তখন তোর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা। তখন বললে তোর পড়াশোনার ক্ষতি হবে, রেজাল্ট হবে, সে জন্যে বলিনি?

'আমার পড়াশুনো কি শেষ হয়ে গেছে?'

'না, তা যায়নি। তবে কোনো এক সময় তো জানাতেই হবে। তা ছাড়া এই উইডো পেনশন নেয়াটা হয়ে যাচ্ছিল, বেশিদিন তো আর এভাবে পেনশন নেয়া উচিত নয়।'

'তাহলে তো তোমাদের বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দেয়া উচিত ছিল। তখন সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলে কেন? বিয়েই যখন করেছ, এটুকু মরাল কারেজ তখন দেখালেই পারতে। তার জন্যে দু-বছর লাগল? ইস্কাপন গলা আরো চড়ায়। সুরঞ্জনা কোনো জবাব দেয় না। ইস্কাপনও

https://boierhut.com/fb

একটু চুপ করে থাকে, বোধ হয় সুরঞ্জনার জবাবের আশায়। সুরঞ্জনার নীরবতায় ইস্কাপন গলা তুলে চিৎকার করে ওঠে, 'শুধু নিজের স্বার্থের কথা ভেবে তুমি এই কাণ্ড করলে? আমাদের কথা একটুও ভাবলে না? এখন লোকের সামনে মুখ দেখাতে পারবে? লজ্জা করবে না? নাকি তোমার সেটুকু লজ্জাও আর বাকি নেই?' সুরঞ্জনার চোখটা নেমে আসছিল, সে জোর করে চোখটা তুলে রেখে ইস্কাপনের দিকে তাকিয়ে থাকে। চিৎকার করে বোধ হয় ইস্কাপনের দম বেরিয়ে গিয়েছিল, সে আবার দম নিয়ে আগের মতোই চিৎকার করে ওঠে, 'আর দুটো-চারটে বছর অপেক্ষা করতে পারলে না, আমি তাহলে যা হোক কিছু পাশ করে ভাইকে নিয়ে আলাদা হয়ে যেতে পারতাম, তোমাদের যা ইচ্ছে তখন তাই করতে।'

সুরঞ্জনা বলে ফেলে, 'আর দু-চার বছর পর আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব ছিল না।'

ইস্কাপন দুই ঊরুতে দুই হাতের পাঞ্জার ভর দিয়ে কোমর থেকে মাথার অংশটা এগিয়ে এনে হাঁ করে সবগুলো দাঁত বের করে গলার শিরা ফুলিয়ে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'এখন তোমার বিয়ের বয়স আছে? উনিশ বছরের মেয়ে আর চৌদ্দ বছরের ছেলে নিয়ে বিয়ের কনে সাজবে তুমি?' ইস্কাপনের ঠোঁটের দুপাশে থুতু জমে উঠছিল, তার দুচোখ দিয়ে জল পড়ছিল। সুরঞ্জনা দেখে, ইস্কাপনের পিছনে তাতা এসে দাঁড়িয়েছে। তাতা এরপর কী বলবে? নাকি তাতা পুরো ঘটনাটা বুঝে নিতে চাইছে। ইস্কাপন চিৎকার করতে করতে দুপা এগিয়ে এসেছিল। এখন সে সুরঞ্জনার প্রায় গায়ের ওপরে। তাতাও দুপা এগিয়ে এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। সুরঞ্জনা তাতার কথা ভেবেই বলার দরকার বোধ করে, 'কোনো কিছুই তো বদলাবে না, সব যেমন ছিল তেমনি থাকবে, আমি আলাদা কোথাও তো আর চলে যাচ্ছি না। তুই না জানলেও কোনো ক্ষতি ছিল না, কিন্তু তুই তো বড় হয়েছিস, তোর সবটা জেনে রাখা ভালো।'

'কী বদলাচ্ছে না? এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সবাই আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে এর মা আবার বিয়ে করেছে। কোয়ার্টারের ঘরে ঘরে আমাদের নিয়ে কথা হবে। কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলবে না। আমাদের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা ঠাট্টা করবে। কী বদলাচ্ছে না? বদলাচ্ছে না? বদলাবেই না যদি তাহলে বিয়ে করতে গেলে কেন? যেমন চলছি, তেমনিই চালাতে। সবাই তো জানে আলোকময়কাকুর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে। সেটাই না হয় রাখতে। এই বয়সে তোমার বিয়ে করার দরকার কী হলো?'

এতগুলো কথা বলতে বলতে ইস্কাপন সুরঞ্জনার প্রায় গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছিল। সুরঞ্জনার হাঁটুর সঙ্গে ইস্কাপনের জামার ঘষা লাগে। ইস্কাপনের মুখের থুতু ছিটকে এসে লাগে সুরঞ্জনার মুখে। সুরঞ্জনা ইস্কাপনের এই কথাতে অপমানিত বোধ করে, বিশেষত তাতার সামনে। সুরঞ্জনা আত্মসম্মান রাখার জন্যে চাপা কিন্তু তীব্র স্বরে বলে ওঠে, 'সব সম্পর্কেরই একটা পরিণতি আছে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি তোমাকে বহুবার বলেছি—তোমাদের ছাড়াও আমার চলবে না, আলোকময়কে ছাড়াও আমার চলবে না। তোমাদের এটা মেনে নিতে হবে।'

ইস্কাপন সুরঞ্জনার গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়েছিল, এই কথায় সে হঠাৎ সুরঞ্জনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুরঞ্জনার চুল ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তাকে মেঝের ওপর ফেলে দেয়, তারপর সুরঞ্জনার গাল খিমচে ধরে, 'লজ্জা করে না তোমার? কেন মেনে নেব? আমার সঙ্গে বিয়ে দেয়া যায় এমন বয়সের একটা লোককে এই বয়সে বিয়ে করতে লজ্জা করে না তোমার?' সুরঞ্জনার গালের ওপর ইস্কাপনের নখ সুরঞ্জনার কানের পাশ দিয়ে গলার দিকে নেমে যায়। যন্ত্রণায় সুরঞ্জনা চিৎকার করে ওঠে, 'একী? আমার লাগছে, ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে।'

তাতা এতক্ষণ পিছনে দাঁড়িয়েছিল। দিদি মাকে মাটিতে ফেলে মারছে দেখে সে দিদির পিঠের ওপর ঘুষি মারতে থাকে, তারপর দিদির চুলের মুঠি ধরে দিদিকে টানে। সে টান সামলানো ইস্কাপনের পক্ষে কঠিন, তার মাথা পিছন দিকে হেলে যায়, তার হাত সুরঞ্জনার ওপর থেকে শিথিল হয়, সে ডান হাতের এক ঝটকায় চুলটা ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতা তখন তার চুলে ধরে আরো জোরে টানছে। ইস্কাপনকে সোজা হয়ে বসতে হয়, তাতা এক লাফে গিয়ে সুরঞ্জনাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে সুরঞ্জনা সোজা হয়ে বসে। ইস্কাপনের খিমচানো ক্ষতটা তখন রক্তবিন্দুতে ভরে যাচ্ছিল।

ইস্কাপন মেঝের অন্য দিকে উপুড় হয়ে ফুলে-ফুলে কাঁদে। সুরঞ্জনাকে শারীরিক লাঞ্ছনা করার পর তার আর নতুন করে কিছু করার ছিল না। এখন সে কান্নার সঙ্গে-সঙ্গে আত্মবিলাপ করছিল। তাতা কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আর সুরঞ্জনার দু চোখ দিয়ে জল বাধাহীন গড়িয়ে পড়ছিল। ইস্কাপন বলছিল, 'সব দোষ তো আমার। আমাকেই তো সবার সঙ্গে মিশতে হয়। আমাকেই তো কলেজে যেতে হয়। কোয়ার্টারের সবাই আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আলোকবাবু তোদের বাড়িতে আসে নাকি, তোর মা আলোকবাবুকে কী বলে ডাকে, তোরা আলোকবাবুকে কী বলে ডাকিস। আমি এই কোয়ার্টারে থাকতে পারব না। কলেজে তো কত রকমের ছেলেমেয়ে আছে। সেখানে কিছু না। কিন্তু আমি এই কোয়ার্টারে থাকতে পারব না। এ কোয়ার্টারে আলোককাকু এলে সবাই লাইন দিয়ে দেখতে দাঁড়াবে। সব দোষ এখন তো আমারই হবে। আমার কষ্টের কথা কেউ ভাবছে না। আমি কি এখন সবাইকে ছেড়ে, ভাইকে ছেড়ে, মাকে ছেড়ে আলাদা হয়ে যাব? আমিই কি সবাইকে আলাদা করে দিচ্ছি। আমি এই কোয়ার্টারে থাকতে পারব না।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

একুশ

মধ্যরাত্রি পার হয়ে গিয়েছে। সুরঞ্জনা-ইস্কাপন-তাতার রাত্রির খাওয়া ভালোভাবেই চুকেছে। ইস্কাপন তার মায়ের গালের ও গলার ক্ষতে বোরোলিন লাগিয়ে দিয়েছে। তাতা আজ সুরঞ্জনার কাছে শুয়েছে। মাঝের দরজাটা খোলাই আছে—ইস্কাপন যাতে ভয় না পায়। শোয়ার পর ইস্কাপন একবার জিগগেস করেছে—'মা, ঘুমিয়েছ?' সুরঞ্জনা বলেছে, 'ঘুমচ্ছি, তুই ঘুমো।'

একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলও সুরঞ্জনা। কিন্তু ঘুমের ঘোরে তাতার হাত এসে গালে পড়ল আর ব্যথায় তার ঘুমটা ভেঙে গেল। অন্ধকারে গালে গলায় হাত দিয়ে বোঝে জায়গাটি একটু ফুলে গেছে। আরো বেশি কি ফুলবে রাত্রিতে—সুরঞ্জনা ভাবে। একটু গরম জলের সেঁক দিলে বোধ হয় ব্যথাটা কমত। নইলে তো কাল সে বেরোতেও পারবে না। কাল কেন, পরশুও পারবে না। যত দিন দাগ থাকবে তত দিন পারবে না। অথচ কাল অফিসে না গেলে তাকে নিয়ে আরো কত নতুন কানাকানি শুরু হবে। কোনো একসময় সুষমাদি কাউকে নিয়ে তাকে দেখতে আসবেনই, যদি সে কাল অফিসে না যায়। কী বলবে সুরঞ্জনা, কাল যদি অফিসে যায় তাহলে অফিসে, বা কাল যদি সুষমাদি আসেন, তবে তাঁকে? বলবে যে তার মেয়ে তাকে বিয়ে করার অপরাধে মেরেছে? সুরঞ্জনার দু-চোখ জলে ভরে ওঠে। এই জল গড়িয়ে যদি গালের বা চোখের পাশের কাটায় পড়ে তাহলে জ্বলবে। সুরঞ্জনা দু চোখে আঁচল চাপা দেয়। তারপর বিছানায় উঠে বসে। চোখটা মুছে সুরঞ্জনা মশারি তুলে বাইরে আসে।

বিছানা থেকে সুরঞ্জনা নেমেছিল একটু জল ফুটিয়ে সেঁক দিতে। কিন্তু সে রান্নাঘরের দিকে যায় না। এই ঘরের সঙ্গে লাগানো একটা ব্যালকনি আছে। সেটা সাধারণত ব্যবহার হয় না। প্যাকিং বাক্স, ভাঙা চেয়ার, আরো নানা আবর্জনার সঙ্গে দুটো-একটা ফুলের টবও আছে। সুরঞ্জনা সেই ব্যালকনির দরজা খোলে। আলো না জ্বালিয়ে নজর তীক্ষ্ণ করে দেখে, ব্যালকনিতে পা ফেলার জায়গা কোথায়। সে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায়। সুরঞ্জনা দেখে, তার সামনে আকাশে আলোকিত মেঘপুঞ্জ অদৃশ্য বাতাসে দ্রুত আকাশ পাড়ি দিচ্ছে।

সুরঞ্জনার দু চোখ আবার জলে ভরে আসে। সে আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। তার তো এখন এমন নির্জন কান্না কাঁদা উচিত নয়। আজকের দিনটা তো সে পাড়ি দিয়েছে। অফিসে জানানো হয়ে গেছে। বাড়িতে জানানো হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তো ইস্কাপন বলেছে, এই কোয়ার্টার ছেড়ে দিলে তার আর এ নিয়ে কোনো আপত্তি থাকবে না। তাহলে কোয়ার্টার ছেড়ে কোথায়ও বাড়ি ভাড়া করতে হবে। সেখানে আবার নতুন লোকজন আলোকময়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক নতুনভাবে বিচার করবে। আবার এমনও হতে পারে—শেষ পর্যন্ত এই কোয়ার্টারটাতেই মানিয়ে নেবে ইস্কাপন, সে নিজেই

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আর পুরনো জায়গা ছেড়ে নতুন জায়গায় যেতে চাইবে না। সে যা হবার হবে। প্রথম ও প্রধান বাধা সে আজ সারাদিন ধরে পার হয়েছে।

সুরঞ্জনা ভাবে, ইস্কাপন তার গায়ে হাত তুলে ফেলার পর মত বদলানো ছাড়া তার আর কিছু করার ছিল না। কিন্তু এখন এই মুখ নিয়ে সুরঞ্জনা না পারবে অফিসে যেতে, না পারবে সুষমাদিদের কারো সঙ্গে কথা বলতে, না পারবে আলোকময়ের সঙ্গে দেখা করতে। আলোকময়কে একটা ফোন করে জানিয়ে দিতে হবে, নইলে আলোকময় অফিসে ফোন করে তাকে না পেয়ে সাতপাঁচ ভাববে। কী জানবে সুরঞ্জনা—ভেবো না, সব ঠিক আছে। একে নিশ্চয়ই সব ঠিক থাকাই বলে। সব বেঠিক হলে আর কী হতো?

একটা কোনো কৈফিয়ত বানাতে হবে যাতে ইস্কাপনকে রক্ষা করা যায়। কী কৈফিয়ত বানাবে সে, তার চোখের কোনা থেকে কণ্ঠা পর্যন্ত চিরে গেছে নখের টানে, সে-দাগ বড় বেশি স্পষ্ট। লুকোপ্লাস্ট দিয়ে জায়গাটা চওড়া করে ঢেকে রেখে সবাইকে বলবে, রান্না করতে গিয়ে আচমকা গরম তেল ছিটকে লেগেছে একেবারে চোখের কোণ থেকে কণ্ঠা?

ঐ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে শুক্লপক্ষের আকাশের মেঘগুলোকে পিছন থেকে বেরোনো দীপ্তির দিকে তাকিয়ে সুরঞ্জনার নিজের সব কিছু খারাপ লাগে। তার এমন একটা নাম, যে-নাম পঁচিশ বছর বয়সের পরে মানায় না, ঠাট্টা মনে হয়, কেউ ডাকলে মিথ্যা শোনায়। সে সুন্দরী নয়, কোনো দিনই সৌন্দর্যচর্চা করেনি, নিজের চেহারা রাখার জন্যে তার কোনো ভাবনা ছিল না। ফলে তার চেহারা ইতিমধ্যেই বয়সের ধ্বংসের পাল্লায় পড়ে গেছে। অন্য মেয়েদের তুলনায় সে কম বয়সে বিয়ে করেছিল, অনেক কম বয়সে তার বাচ্চা হয়েছিল। সে আর-দশটা বা একশটা বা হাজারটা মেয়ের মতো হয়ে যেতে চেয়েছিল। অথচ সেই ঘটনাক্রমে হয়ে দাঁড়াল এক প্রতিনিধি। কার প্রতিনিধি সে জানে না, আলোকই-বা কার প্রতিনিধি সে জানে না—কিন্তু তারা আর ঐ একশজন, হাজারজন বা এমনকি লাখজনের ভিড়েও মিশে থাকতে পারল না। মিশে যেতে পারলে বেঁচে যেত সুরঞ্জনা। কিন্তু তার কপালে যে সে একা হয়ে গেছে, ব্যতিক্রম হয়ে গেছে, সেই একক ব্যতিক্রম রক্ষা করা ছাড়া তার তো আর কোনো ভবিতব্য নেই। সেই ভবিতব্য থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ছিল আলোকময়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা। সে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সুরঞ্জনার তো আর কিছুই বাকি থাকবে না। সেই সম্পর্কের জন্যে আজ তার মেয়ে তাকে আঘাত করেছে। সুরঞ্জনা এই রাত্রির একাকিত্বে বোজে—তার অফিস, তার কোয়ার্টারের লোকজন, তার পাড়া-প্রতিবেশী সবাই মিলে ইস্কাপনের হাত দিয়ে তাকে মারল। আর সেই আগাতের পরও সুরঞ্জনা তার এই অপছন্দের নামটা নিয়ে সুরঞ্জনাই আছে। যে প্রতিনিধিত্বের দায় তার অজ্ঞাতে তার ওপর চেপেছে সে সেই প্রতিনিধিত্বে নিজেকে অনড় রাখতে পেরেছে। সবার যা মনে হচ্ছে হোক, সুরঞ্জনা তো জানে আলোকময় আর তার সম্পর্কটা সবচেয়ে ব্যক্তিগত, সঙ্গত ও স্বাভাবিক। এই সম্পর্কটা যদি তারা রক্ষা করতে না

https://boierhut.com/fb

পারত, তাহলে ধর্মাচার, দেশাচার, লোকাচার অক্ষুণ্ন থাকত, কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটত না। তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এতটাই ব্যক্তিগত যে সেই ধর্মাচার, দেশাচার, লোকাচার বিঘ্নিত হয়ে গেছে। সুরঞ্জনা নিজের জন্যে কোনো বিদ্রোহিণীর ভূমিকা ভাবতে পারে না, অথচ সে এখন মধ্যরাতে ক্ষতচিহ্ন মুখে নিয়ে একা একা দাঁড়িয়ে আছে বিদ্রোহিণীরই ভূমিকায়। সে তাই থাকবে অথচ কাল গালে লুকোপ্লাস্ট লাগিয়ে ইস্কাপনকে বাঁচাবে।

আর আলোকময়কে এই আঘাত কত দিন ধরে সয়ে আসতে হচ্ছে। তাদের ভাইদের মিলিত সংসার, মা এখনো বেঁচে। সুরঞ্জনার সঙ্গে সম্পর্কের জন্যে সে বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, মাকে ছেড়ে দিয়েছে, দাদাকে ছেড়ে দিয়েছে। সুরঞ্জনা শুনেছে আলোকের দিদি অদিতির নাকি এক মেয়ে আছে, ইস্কাপনের সমবয়সী, এক সে-ই নাকি এ-সম্পর্কের সমর্থক। তবে তার সমর্থনে আর কী যায়-আসে।

সুরঞ্জনা দেখে—সামনে এ সংকটের কোনো স্থায়ী সমাধান নেই, তারা কোথায় থাকবে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলোকময়ের কী সম্পর্ক গড়ে উঠবে, আলোকময়ের সঙ্গে তার, সুরঞ্জনার, কী সম্পর্ক গড়ে উঠবে সবই অনিশ্চিত, কোনো কিছুর পূর্বনির্দিষ্ট সমাধান নেই, তাকে ও আলোকময়কে এই জীবনটা যাপন করতে করতে এই জীবনটা তৈরি করতে হবে। এখন পর্যন্ত তারা শুধু এটুকু মাত্র প্রমাণ করতে পারল, নিজেদের কাছে ও সেই কারণেই বাইরের কাছে, যে তারা দুজন দুজনের পক্ষে অপরিহার্য, তারা পরস্পরের বিচ্ছেদ মেনে নেবে না, তাদের কাছে তারা দুজন অনিবার্য। সুরঞ্জনা আলোকময়ের স্ত্রী, আলোকময় সুরঞ্জনার স্বামী।

সেই বাতিল জিনিসে নোংরা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নাধোয়া চরাচরের দিকে দুচোখ মেলে সুরঞ্জনা গভীর আশ্লেষে উচ্চারণ করে, 'আলোক, আমার আলোক।'

সেই ব্যালকনিতে, সেই মধ্যরাত্রি পেরনো মেঘরাশির গতির নিচে নিজের ক্ষতলাঞ্ছিত মুখ নিয়ে সুরঞ্জনা আলোকময়ের সঙ্গে গভীরতম দাম্পত্যে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। যেন তাদের বিবাহ আজ ঘোষিত হয়নি, কোনো এক অনির্দিষ্ট অতীত থেকে তাদের দাম্পত্য দীর্ঘ দীর্ঘ সময় ধরে চলে এসেছে। দাম্পত্যের সেই শুদ্ধ-কোমল-প্রাচীন নিবিড়তায় সুরঞ্জনার চোখ চলে ভরে ওঠে, সেই জলের আড়ালে বাইরের শুক্লপক্ষ আবছা হয়ে যায়।

https://boierhut.com/fb